সেকালের কথা

প্রাচীনকালের জীবজন্তুর কাহিনীসম্বলিত

সুচিত্র শিশুপাঠ্য পুস্তক।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি. এ. প্রণীত

কলিকাতা

১৯০৩ সাল

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি
দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

অবসরকালে পড়িয়া বালকবালিকাগণ শিক্ষা এবং আনন্দ লাভ করিবে, এই আশায় এই পুস্তকখানি লিখিত হইল। বিষয়টি বৈজ্ঞানিক হইলেও, সে হিসাবে তাহার কোনরূপ চর্চ্চার চেষ্টা হয় নাই। বালকবালিকাদিগকে প্রাচীনকালের কাহিনী শুনাইবার জন্যই এই পুস্তক লেখা; বিজ্ঞানের কথা বলা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ছেলেদিগকে যেরূপ করিয়া জানোয়ারের গল্প শুনাইলে তাহারা আমোদ পায়, সেইরূপ সহজকথায় সরলভাবে এই পুস্তকখানি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং সকল কথাই বিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে মাপিয়া বলা সম্ভব হয় নাই, আর তাহার আবশ্যকও বোধ হয় নাই। আশা করি, এ সম্বন্ধে ত্রুটি অল্পই হইয়াছে, এবং আমার উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলে তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

এই পুস্তকে ১৭ খানি বড় বড় ছবি আছে। এই সকল ছবি এই পুস্তকের জন্যই বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল; ইহাদের একটিও ইংরাজি পুস্তকের ছবির নকল নহে। পুস্তকের ভাষা ও বিষয়সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এই ছবিগুলির সম্বন্ধেও আমার তাহাই বক্তব্য। ছবিগুলি আঁকিবার সময় উহাদিগকে যথাসম্ভব নির্দ্দোষ করিতে যতদূর চেষ্টা ছিল, শিশুদিগের হিসাবে সুন্দর করিতে তদপেক্ষা অধিক চেষ্টা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, যত ভাল করিয়া আঁকা উচিত ছিল, তাহা পারি নাই। তথাপি আশা করি, এই সকল ছবিতে বৈজ্ঞানিক হিসাবে গুরুতর ত্রুটি লক্ষিত হইবে না; কারণ এই ছবিগুলি দেখিয়া একজন উচ্চপদস্থ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্ণিত জন্তুগুলির ইংরাজি নামই রাখিয়াছি। এই সকল নামকে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল কি না, জানি না। আমি ইংরাজি নামগুলির বাঙ্গালা অর্থ বলিয়া দিয়াই যথেষ্ট মনে করিয়াছি। ইহাদের যথোচিত বাঙ্গালা পরিভাষা রচনা করা, আমার সাধ্যের অতীত। আর, তাহা আমার প্রয়োজনেরও বহির্ভূত; কারণ, এখানি গল্পের বই,—বৈজ্ঞানিক পাঠ্য পুস্তক নহে।

কলিকাতার যাদুঘরের কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করিয়া, এই পুস্তকে যাদুঘরে রক্ষিত কোন কোন দ্রব্যের ছবি মুদ্রিত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এজন্য, এবং এতদুপলক্ষে আমি তাঁহাদের নিকট যে সরল সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

"সেকালের কথা" প্রথমে "মুকুল" নামক মাসিক-পত্রিকায় বাহির হয়। তাহাকেই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া এই পুস্তক হইয়াছে। মুকুলে যে সকল ছবি বাহির হইয়াছিল, তাহা এ পুস্তকে গ্রহণ করা হয় নাই; ইহার ছবিগুলি সমস্তই নূতন। ইতি।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

এই পুস্তকে নিম্নলিখিত ১৭ খানি ফুল্ পেজ ছবি, এবং তদ্ভিন্ন অনেকগুলি ছোট ছোট ছবি আছে।—

১। সেকালের চিংড়ি।

২। ইক্‌থিয়োসরস্।

৩। প্লাসিয়োসরস্।

৪। ব্রণ্টোসরস্।

৫। মিগালোসরস্।

৬। ইগুয়ানোডন্।

৭। ট্রাইসিরেটপ্স্।

৮। ষ্টিগোসরস্।

৯। হেস্পারর্নিস্ ও ইক্‌থিঅর্নিস্।

১০। প্যালিয়োথীরিয়ম।

১১। ডাইনোথীরিয়ম।

১২। ম্যাষ্টোডন্।

১৩। ম্যামথ্।

১৪। শিবথীরিয়ম্।

১৫। মিগাথীরিয়ম্।

১৬। মাইলোডন্।

১৭। আর্কিঅপ্টেরিক্‌স্।

"ইনিশিয়েল্" অর্থাৎ প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে যে ছবিগুলি আছে, তাহাদের পরিচয় এইরূপ—

১। প্রথম ইনিশিয়েল "সা"। ইহাতে ম্যামথ্ ও এল্‌কের ছবি আছে।

২। দ্বিতীয় ইনিশিয়েল্ "আ"। ইহাতে চুনারের ঢেউয়ের দাগওয়ালা পাথরের ছাব আছে।

৩। তৃতীয় ইনিশিয়েল্ "পৃ"। ইহাতে ম্যামথের ছবি আছে।

৪। চতুর্থ ইনিশিয়েল্ "পৃ"। ইহাতে সেকালের গাছের ছবি আছে।

৫। পঞ্চম ইনিশিয়েল্ "ইং"। ইহাতে ল্যাবিরিন্থোডনের পায়ের দাগের ছবি আছে।

৬। ষষ্ঠ ইনিশিয়েল্ "কো"। ইহাতে প্রাচীনকালের কুমীর এবং পাখীর ছবি আছে।

৭। সপ্তম ইনিশিয়েল্ "অ"। ইহাতে যে শিংওয়ালা কুমীরের ছবি আছে, তাহা কিরাটো-সরস্। কিরাটোসরস্ যাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়াছে, তাহার নাম লাড্রোসরস্। এই ডাইনো-সরের হাঁসের মতন ঠোঁট ছিল। দূরে যে ছোট ডাইনোসরটি লাফাইয়া পলাইতেছে, তাহার নাম স্কেলিডোসরস্।

৮। অষ্টম ইনিশিয়েল "আ"। ইহাতে প্রাচীন ভ্রমণকারীদের বর্ণিত কচ্ছপের খোলার চালওয়ালা ঘরের ছবি আছে।

সেকালের চিংড়ি।

ইহাদের এক একটা ছয় ফুট লম্বা হইত। (১৪ পৃষ্ঠা দেখ।)

পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সে সকল জন্তু লোপ পাইয়াছে, আর, হয়ত তাহারা কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই।

জন্তু আবার লোপ পায় ?

হাঁ পায়। বর্ত্তমান সময়ে বলিতে গেলে আমাদের চক্ষের সাম্‌নেই কতকগুলি জন্তু লোপ পাইয়াছে। নিউজীলণ্ড দ্বীপে "মোয়া" নামক এক প্রকার অতি বৃহৎ পক্ষী ছিল।

মোয়া।

ডোডো।

প্রাচীন ভ্রমণকারীদের কেহ কেহ এই পক্ষী দেখিয়াছেন, এমন কথাও শুনা যায়। কিন্তু এখন আর সে পাখী নাই। মোয়ার ডিম এবং কঙ্কাল এখনও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু জীবিত মোয়া আর দেখা যায় না। মাদাগাস্কার দ্বীপে "ডোডো" নামক আর এক প্রকার পাখী ছিল। এই পাখী পায়রার জাতীয়। সে উড়িতে জানিত না, অথচ খাইতে খুব ভাল ছিল। কোন কোন সাহেব এই পাখী খাইয়া তাহার অতিশয় সুমিষ্ট বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা খাইতে এত ভাল লাগে, তাহাকে যদি এত সহজে

শিকার করা যায়, তবে মানুষের মত রাক্ষস তাহাকে দু'দিনে খাইয়া শেষ করিবে, তাহা বিচিত্র কি? বৃহৎ "অক্" নামক আর একটি পাখীও এইরূপে অতি অল্প-দিন যাবৎ লোপ পাইয়াছে। নিউফাউণ্ড্ ল্যাণ্ডের উপকূলে এক সময়ে এই পক্ষী লাখে লাখে বাস করিত। ইহারও উড়িবার শক্তি ছিল না; কিন্তু জলে সাঁতরাইবার

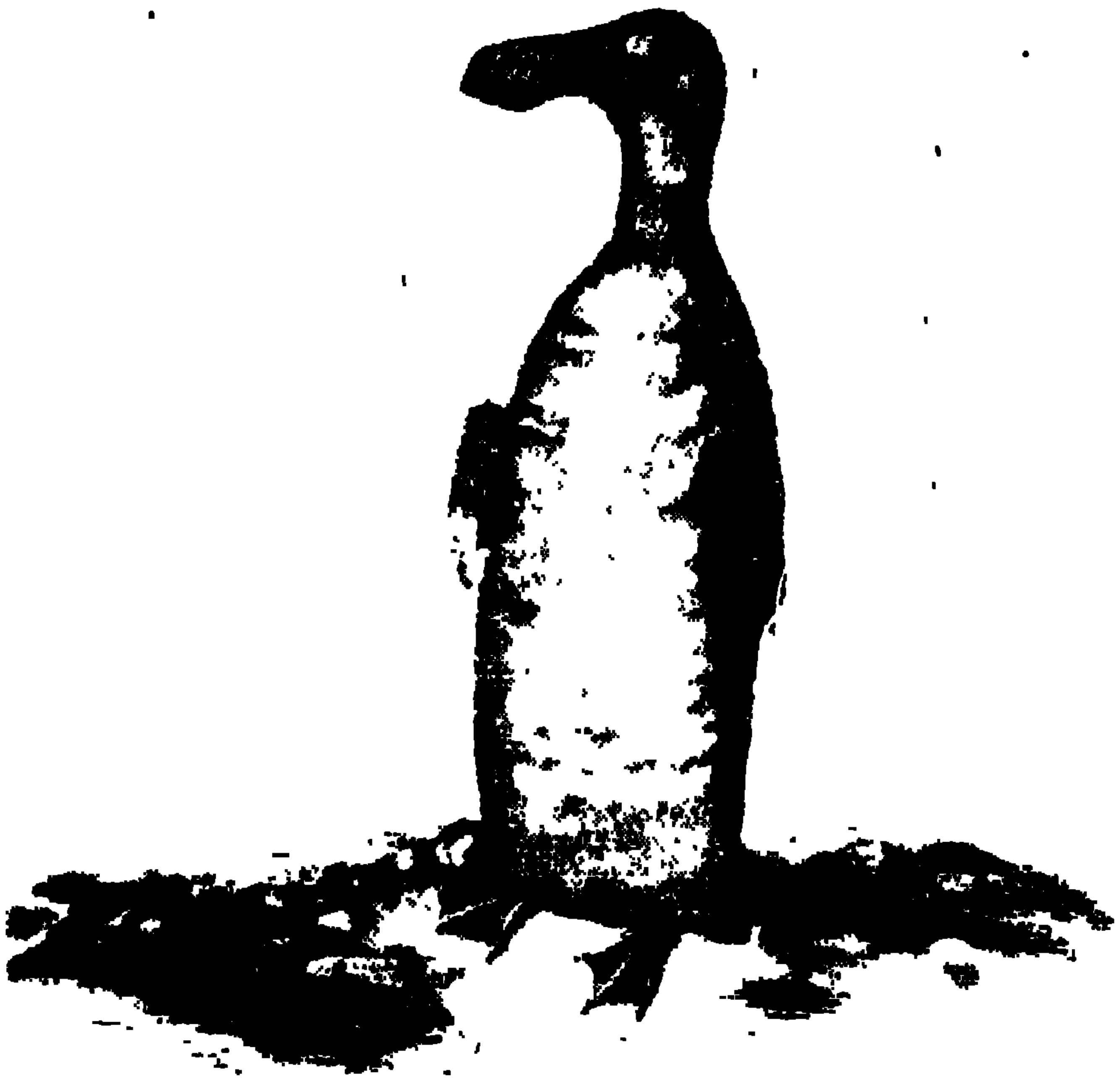

বৃহৎ অক্।

ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। স্থলে ইহারা ভালরূপ চলিতে পারিত না। ঐ পথে যাতায়াত করিবার সময় জাহাজের লোকেরা লাঠি দ্বারা এই পক্ষী মারিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইত।

"ম্যামথ্" নামে এক প্রকার লোমওয়ালা হাতী ছিল, তাহাও খুব বেশী দিন হয় নাই, লোপ পাইয়াছে। প্রাচীন অসভ্য লোকদের সময়ে এই জন্তু বর্ত্তমান ছিল। তাহারা ইহার চেহারা আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

আয়র্লণ্ড দেশে এল্ক্ নামক এক প্রকার হরিণের হাড় পাওয়া যায়। এখন সে জন্তু জীবিত নাই। এই জন্তু যখন ছিল, তখন মানুষও নাকি ছিল; আর তাহারা তাহাকে মারিয়া খাইত, এরূপ অনেকের বিশ্বাস। এল্কের হাড়ে নাকি অনেক সময় সেই প্রাচীন মনুষ্যের অস্ত্রের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুতরাং জন্তু যে লোপ পায়, এ কথায় কোন সন্দেহের প্রয়োজন নাই। এইরূপে কত জন্তু যে লোপ পাইয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অদ্যাপি যাহাদের চিহ্ন

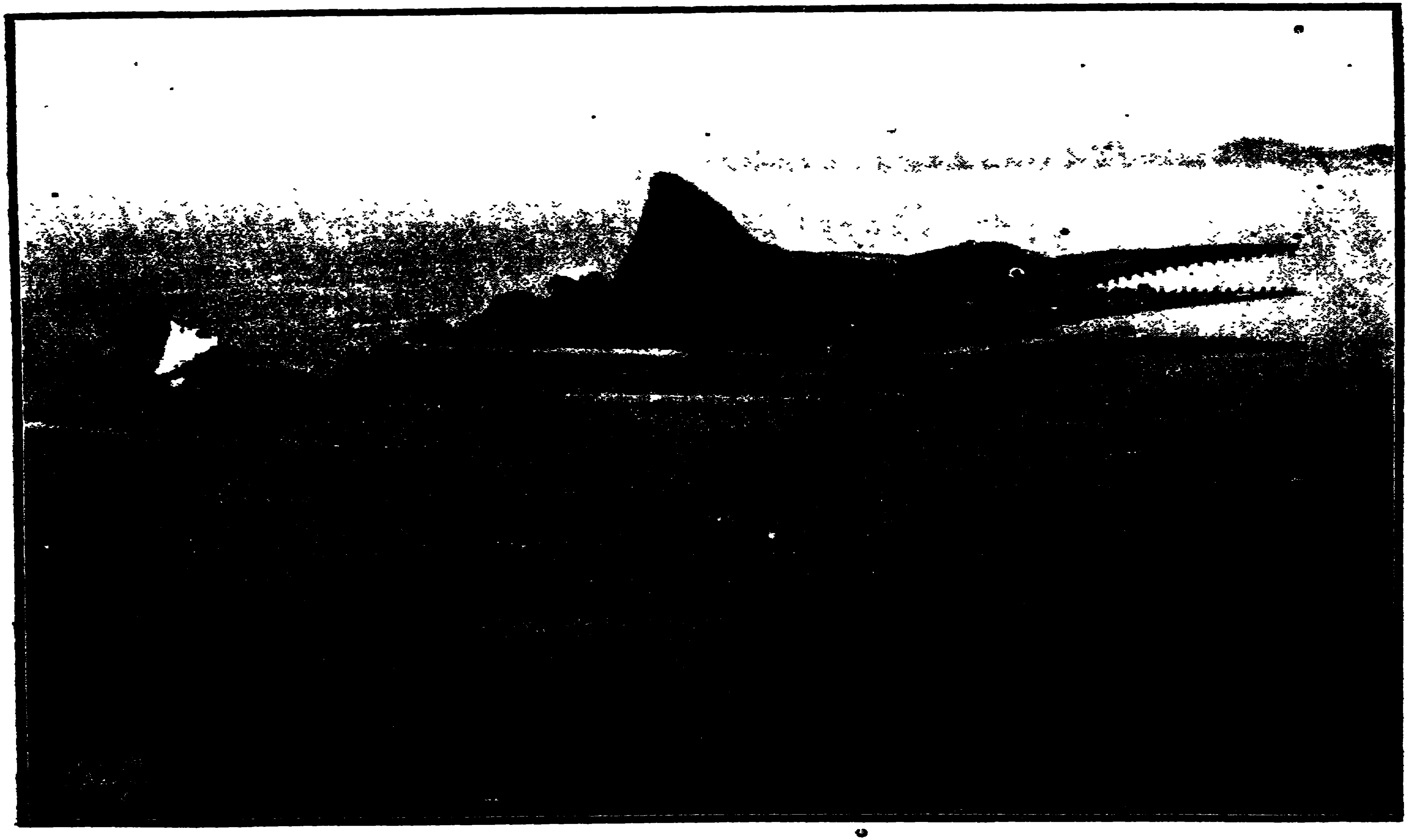

৩

ইক্থীয়োসরস্!

মাছের মতন চেহারাওয়ালা অতি ভয়ঙ্কর সেকালের কুমীর। প্রায় ৪০ ফুট লম্বা হইত। (২০ পৃষ্ঠা দেখ।)

রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু সকলেই ত আর চিহ্ন রাখিয়া মরিবার অবসর পায় না। এক শতটির মধ্যে একটির এরূপ সৌভাগ্য হয় কি না সন্দেহ। মাংস চামড়া ইত্যাদি কোমল জিনিস ত পচিয়াই যায়। অস্থানে পড়িলে হাড়েরও সেই দশাই হয়। শরীরের মধ্যে কেবল দাঁতগুলিই যা' একটু মজবুত; সেগুলি অনেক দিন থাকে। এই জন্য জন্তুর অন্যান্য অংশের চাইতে দাঁতই বেশী পাওয়া যায়। কোন কোন জন্তুর কেবল দাঁতই পাওয়া গিয়াছে, আর কিছু এখনও পাওয়া যায় নাই।

এইরূপ সামান্য চিহ্ন দেখিয়া একটা জন্তুর পরিচয় সংগ্রহ করা কম ক্ষমতার কার্য্য নহে। যাঁহারা সমস্ত জীবন ধরিয়া খালি জন্তুর শরীরগঠন সম্বন্ধে চর্চ্চা করেন তাঁহাদেরই ঐরূপ ক্ষমতা জন্মান সম্ভব হয়। জন্তুর স্বভাবের উপযোগী করিয়া তাহার শরীরের প্রত্যেক অংশ গঠিত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা রীতিমত এ বিষয়ের চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা সামান্য একটি হাড়ের টুক্‌রা মাত্র দেখিয়াই অনেক সময় বলিতে পারেন, যে সেই হাড় কিরূপ জন্তুর, এবং সেই জন্তুর স্বভাব কিরূপ ছিল।

এইরূপে সেকালের জন্তুদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়াছে। এই সকল জন্তুর কোন্‌টা ঠিক কতদিন পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই; তবে মোটামুটি কোন্ জন্তুটা আগেকার, কোন্‌টা পরের, তাহা অনেক সময় সহজেই স্থির হইতে পারে। পৃথিবীর শরীরটা নানা রকম মাটি এবং পাথর দিয়া গড়া। মোটামুটি একথা বলা যায়, যে নীচের মাটি অথবা পাথর আগেকার; উপরের মাটি অথবা পাথর পরের। যদি এরূপ দেখা যায় যে কোন এক প্রকারের মৃত্তিকা সর্ব্বদাই অন্য কোন প্রকারের মৃত্তিকার উপরে থাকে, নীচে কখনও থাকে না, তবে একথা মনে করা অসঙ্গত হয় না, যে ঐ নীচেকার মাটি উপরকার মাটির চাইতে পুরাতন। এইরূপ করিয়া নানা রকম মাটি এবং পাথরের বয়স স্থির হইয়া থাকে, এবং ঐ সকল মাটিতে অথবা পাথরে যে জন্তুর চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহারও ঐরূপ বয়সই সাব্যস্ত হয়।

এইরূপে দেখা যায়, যে শামুক, গুগলি, প্রভৃতির জাতীয় জন্তু সকলের আগে জন্মিয়াছিল। মাছ, কুমীর ইত্যাদি তাহার পরে। শেষে স্তন্যপায়ী * জন্তু, এবং তাহাদের ভিতরে আবার মানুষ সকলের শেষে জন্মিয়াছে।

* অর্থাৎ যাহারা শিশুকালে মায়ের দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করে। সকল জন্তুর মধ্যে এই শ্রেণীর জন্তুই শ্রেষ্ঠ। মানুষও এই শ্রেণীর জন্তু।

আমরা একবার চুনার গিয়াছিলাম। সেখানে বেলে পাথরের পাহাড় আছে। সেই পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া আনিয়া, লোকে ঘর বাড়ী তয়ের করে। সে পাথর কি করিয়া কাটে, জান? কাঠ চিরিবার মতন করিয়া করাতের দ্বারা তাহা কাটা হয় না। ইহার উপায় অন্যরূপ।

পুস্তকে যেমন ভাবে পাতাগুলি থাকে, সেই সকল পাহাড়ে তেমনি করিয়া পাথরের পাত সাজান থাকে। ঐ সকল পাতের মাঝখানে লোহার ছেনি ঢুকাইয়া, তাহাতে হাতুড়ির ঘা মারিলে, পাথরখানা আপনা হইতেই চিরিয়া দুভাগ হইয়া যায়। এইরূপ করিয়া প্রকাণ্ড পাথর হইতে পাতলা তক্তা বাহির করিতে হয়। তক্তাগুলি অনেক সময় এমনি পরিষ্কার বাহির হয়, যে, তাহা দেখিলে বিশ্বাস করিবে না, যে ওগুলি এক একখানা করিয়া হাতে প্রস্তুত করা হয় নাই।

আমি অনেকবার দাঁড়াইয়া ঐরূপ পাথর চেরা দেখিয়াছি। আর সেই সময়ে মাঝে মাঝে আর যে একটা ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহা অতি আশ্চর্য্য। নদীর চড়ার বালিতে যেমন ঢেউয়ের দাগ থাকে, অনেক সময় ঐ সকল পাথরের গায়ে অবিকল সেইরূপ দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তোমার সাধ্য নাই যে উহাকে ঢেউয়ের দাগ ভিন্ন আর কিছু বল। কথাটা যতই আশ্চর্য্য বোধ হউক না কেন, উহা যে ঢেউয়ের দাগ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। নদীর তলায় নানা রকমের পোকা চলা ফেরা করে, নরম মাটিতে তাহার দাগ পড়ে। বেলে পাথরে অনেক সময় সেই দাগগুলি পর্য্যন্ত অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়। চুনারের পাথরে আমি অনেক খুঁজিয়াও ঐরূপ দাগ দেখিতে পাই নাই বটে, কিন্তু ঐরূপ দাগওয়ালা পাথর অন্য স্থান হইতে কলিকাতার যাদুঘরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। যাহাদের সুবিধা আছে, ইচ্ছা করিলেই গিয়া দেখিয়া আসিতে পার। উড়িষ্যার অন্তর্গত তালচিরের পাহাড়ে এইরূপ পাথর পাওয়া যায়।

বেলে পাথর আর নদীর তলার বালিতে প্রভেদ খালি এই যে, একটা এখনও কোমল রহিয়াছে, আর একটা কোন কারণে জমাট বাঁধিয়া পাথর হইয়া গিয়াছে। জিনিস একই।

ব্রণ্টোসরস্।

১০৬ ফুট লম্বা নিরামিষভোজী ডাইনোসর। তিমি ভিন্ন এত বড় জন্তু আর পৃথিবীতে নাই

(২৪ পৃষ্ঠা দেখ।)

জিনিস দেখিয়াই তাহা হইতে কত নূতন কথা বাহির করেন। হাতীর হাড়কে মানুষের হাড় মনে করিয়া কতবার লোকে ঠকিয়াছে। একটী ভদ্রলোক অনেক দিন কোন পাহাড়ে জায়গায় ছিলেন। সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, যে সে দেশে না কি এখনও দানবের হাড় পাওয়া যায়, আর সেই হাড় না কি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। উহা যে হাতীর হাড় তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। ফ্রান্স্ দেশে একবার এইরূপ কতকগুলি হাড় পাওয়া গিয়াছিল। এক ডাক্তার সেই হাড়গুলি কিনিয়া সকলকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, ওগুলি রাজা টিউটোবোকসের হাড়—সে একটা প্রকাণ্ড গোরের ভিতরে তাহা পাইয়াছে। সে আরো বলিল, যে সেই গোরটা ৩০ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট চওড়া ছিল, আর তাহার উপরে লেখা ছিল—"রাজা টিউটোবোকস্"।

এই কথা যে শুনে সেই অবাক্ হয়। ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুই পর্য্যন্ত ঐ হাড় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। রিয়োলাঁ নামক একজন পণ্ডিত ঐ হাড়গুলি দেখিয়া বলিলেন, যে ওগুলো মানুষের হাড় নয়, হাতীর হাড়। ইহাতে প্রথমে অনেকেই তাঁহার উপর ভারি বিরক্ত হইল। যাহা হউক, শেষে ইহাই স্থির হইল, যে উহা মানুষের হাড়ও নহে, অথচ ঠিক আজ কালকার হাতীর হাড়ও নহে। ওগুলি যে এক প্রকার হাতীর হাড়, তাহা ঠিক বটে, কিন্তু ওরূপ হাতী এখন আর পৃথিবীতে নাই। ইহার পরে ঐ জন্তুর আরো অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা ইহাকে এখন বেশ ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, আর ইহার নাম দিয়াছেন "ম্যাষ্টোডন্"। এই জন্তু হাতীর চাইতেও বড় ছিল। যে কঙ্কালের কথা বলিলাম তাহা পঁচিশ ফুট লম্বা, আর দশ ফুট চওড়া।

এই ঘটনা হইতেও একথা জানিতে পারিতেছি যে প্রাচীন কালে এমন জন্তু ছিল, যাহা এখন আর নাই। বাস্তবিক অতি প্রাচীন কালের যে সকল জন্তুর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিই এখন বাঁচিয়া নাই; সব লোপ পাইয়াছে। এমন সব অদ্ভুত জন্তু এক সময়ে পৃথিবীতে ছিল, যে দিদিমার গল্পের ভিতরেও তেমন আশ্চর্য্য জন্তুর কথা থাকে না।

পৃথিবীর প্রাচীন কালের ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য। তোমরা গল্প শুনিয়া কত আমোদ পাও, কিন্তু পৃথিবীর কথা শুনিলে হয় ত মনে করিবে, যে গল্পের চাইতে সত্য কথার ভিতরেই বেশী আমোদ।

পৃথিবীর সম্বন্ধে কোন কথা যদি ঠিক করিয়া বলা যায়, তবে তাহা এই যে, এখন যেমন দেখিতেছ, পৃথিবী চিরকাল তেমন ছিল না। কিছুদিন আগে আমরা এ পৃথিবীতে ছিলাম না; আর একথাও নিশ্চয় যে, আর কিছুদিন পরে আমরা কেহই এ পৃথিবীতে থাকিব না। এই যে কলিকাতা সহর, দুইশত বৎসর আগে এই সহরই কোথায় ছিল! এখন যেখানে সুন্দর সুন্দর বাড়ীতে সাহেবেরা বাস করেন, দুইশত বৎসর আগে সেখানে কুমীরেরা রোদ পোহাইত, আর বাঘেরা শিকার খুঁজিয়া বেড়াইত। এমন লোক এখনও বাঁচিয়া আছে, যাহারা ছেলেবেলায় কলিকাতার অনেক স্থানে প্রকাণ্ড বন দেখিয়াছে, সেখানে দিনে দুপুরে ডাকাতি হইত।

এ সকল তো নিতান্তই আজ কালকার কথা। প্রাচীন কালের অবস্থা আর এখনকার অবস্থায় ইহা অপেক্ষা আরো ঢের বেশী তফাৎ ছিল। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে এমন সব চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, যে তাহাতে বোধ হয় যেন সে সকল স্থান এক সময়ে বরফে ঢাকা ছিল। অধিক কথায় কাজ কি, এই যে হিমালয় পর্ব্বত—যাহার সমান উচু পর্ব্বত পৃথিবীতে নাই বলিয়া আমরা এত অহঙ্কার করি—এই হিমালয় এককালে ছিল না। অন্ততঃ তাহা এত বড় ছিল না।

তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে, যে হিমালয়ে এমন সব জন্তুর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে যে তাহারা সমুদ্রে থাকে। যদি একথা সত্য হয় যে ওখানে এক সময়ে সমুদ্র ছিল, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, আমাদের ভারতবর্ষের চেহারাটা তখন কি রকম ছিল।

ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে যে সকল পাহাড় আছে তাহার অনেকগুলির অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে এক সময়ে ভারতবর্ষ ঐ সকল পাহাড়ের সমান উচু ছিল। ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি নানা কারণে পৃথিবীর উপরটা ক্রমেই ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। এইরূপ কারণে এক সময়ের সেই উচু ভারতবর্ষ ক্রমে ক্ষয় হইয়া আজ কাল ঐ পাহাড়গুলি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

কেবল ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর সকল স্থানেই এইরূপ। উত্তর মেরুর কাছে প্রাচীন কালের যে সকল চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, যে এক সময়ে সে স্থানটী আমাদের দেশের মতন গরম ছিল।

যেখানে যাও, সেখানেই এইরূপ দেখিবে। ঠাণ্ডা দেশ হয়ত এককালে গরম ছিল,

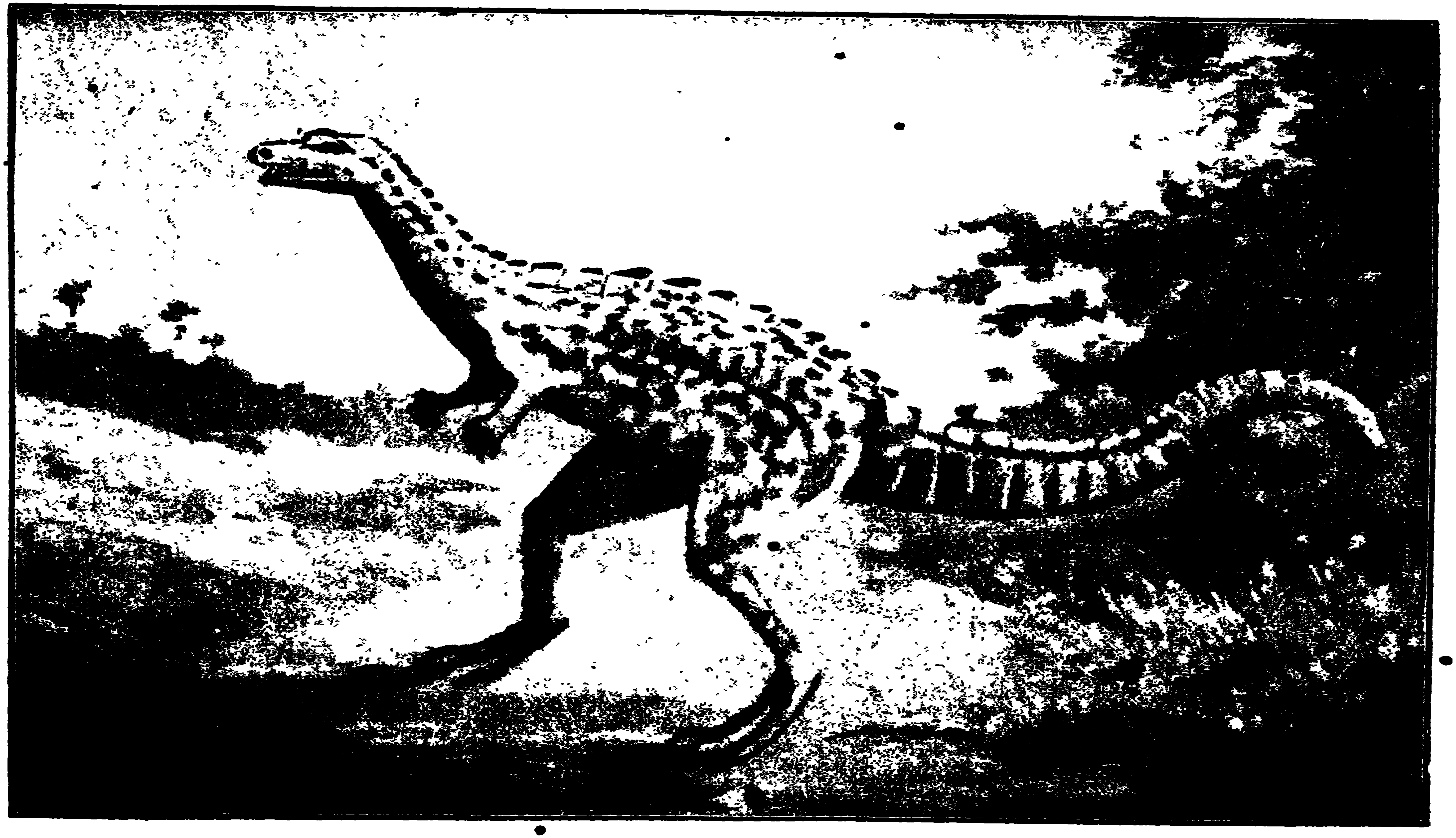

মিগালোসরস্ ।

মাংসখেকো ডাইনোসর । বাঘের মতন হিংস্র ছিল ; হাতীর মতন বড় ছিল ; কাঙ্গারুর মতন লাফাইতে পারিত ; মানুষের মতন দু পায় ছুটিয়া বেড়াইত । (২৭ পৃষ্ঠা দেখ ।)

গরম দেশ এককালে ঠাণ্ডা ছিল। ঐ যে উচু পর্ব্বত, সমুদ্রের তলায় তাহার জন্ম হইয়াছিল; আর ঐ যে সমুদ্র দেখিতেছ, এক সময়ে তাহার স্থানে একটা দেশ ছিল।

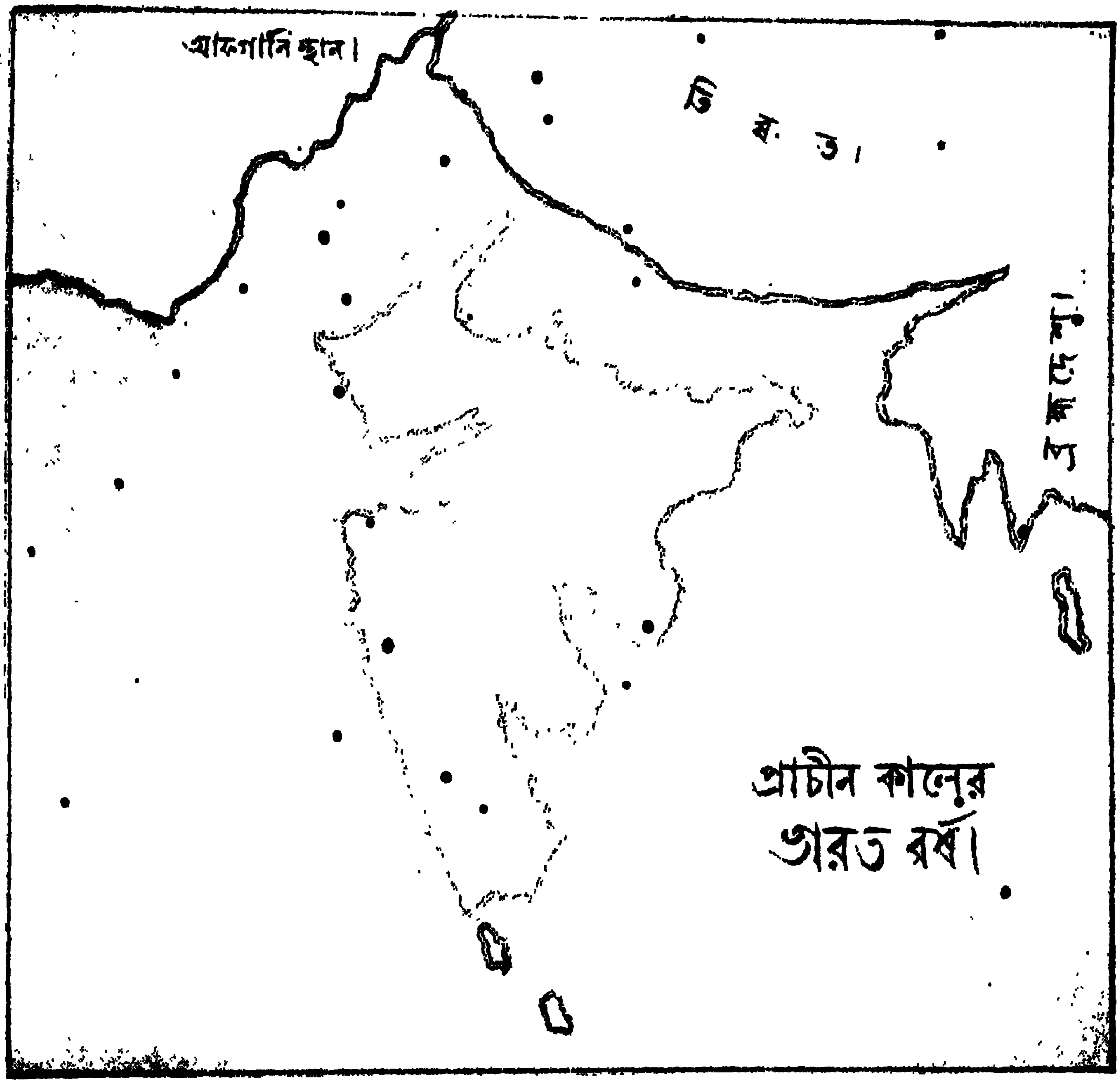

ভারতবর্ষের নানা স্থানের মাটি পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের অপেক্ষাকৃত নীচু স্থানগুলি এক সময়ে সমুদ্রের তলায় ছিল। অর্থাৎ এখন যে সকল স্থানের ভিতর দিয়া গঙ্গা এবং সিন্ধু নদী বহিতেছে তাহার সমস্তটাই প্রাচীন কালের শেষ ভাগে সমুদ্র ছিল। সিন্ধুদেশ, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, বাঙ্গালা, এসকলের তখন কিছুই ছিলনা। রাজপুতানা, মধ্য দেশ ও দাক্ষিণাত্যের কতক অংশ লইয়া একটা দ্বীপ সেই প্রাচীন কালের সমুদ্রে ভাসিত। তাহাই তখনকার ভারতবর্ষ।

পৃথিবীর জন্মাবধি এ পর্য্যন্ত তাহাতে কত পরিবর্ত্তন যে হইয়াছে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। পাথর পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা ইহার কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও অতি সামান্যই বলিতে হইবে; কারণ, পাথরে আর কত বিষয়ের চিহ্ন

থাকা সম্ভব হয়? তথাপি, এই সামান্য যেটুকু জানা গিয়াছে তাহাও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আজ কাল মানুষেরা পৃথিবীতে খুব প্রভুত্ব করিতেছে, কিন্তু দু তিন লক্ষ বৎসর আগে হয়ত মানুষ বলিয়া একটা জানোয়ারই পৃথিবীতে ছিল না। তখন হাতীদের রাজত্ব ছিল। উত্তর সাইবেরিয়ার এক এক স্থানে এত হাতীর হাড় পাওয়া যায় যে, আজও তাহাদ্বারা প্রকাণ্ড কারবার চলিতেছে। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন কালের পাথরে হাতীর চিহ্নও পাওয়া যায় না। তখনকার বড় লোক ছিলেন কুমীর আর গোসাপ মহাশয়েরা। সে কি যেমন তেমন কুমীর আর গোসাপ? আজ কালকার কুমীরেরা ত তাহাদের সামনে টিকটিকি! তাহাদের মাঝারিগুলি ৪০।৫০ ফুট লম্বা হইত; বড় বড়গুলি ১০০।১৫০ ফুটের কম হইত

ক্লিডাষ্টিস্ নামক সেকালের কুমীর। ৪০ ফুট লম্বা।

না। তাহাদের এক একটা আবার পিছনের পায় ভর দিয়া উঠিয়া চলিতে পারিত। বাস্তবিক জন্তু হইতে হইলে ঐ রকমই হওয়া ভাল! আমরা কি জন্তু? আমরা ত পিঁপড়ে।

যাহা হউক, আরো কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কুমীরও পৃথিবীতে ছিল না। তখন ছিল, খালি মাছ, শামুক আর কাঁকড়া জাতীয় জন্তু। তাহারও পূর্ব্বে হয়ত খালি গাছ পালাই ছিল।

তাহার পূর্ব্বে?

তাহার পূর্ব্বে পৃথিবীতে জীব জন্তু বা গাছ পালা কিছুই ছিল না। পৃথিবী এত গরম ছিল যে, তখন তাহাতে জীব জন্তু থাকা সম্ভবই হইত না। আকাশ ধোঁয়ায় আর মেঘে অন্ধকার ছিল; সূর্য্যের আলো তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পাইত না। পৃথিবীর উপরিভাগ তপ্ত কড়ার মতন গরম ছিল। তাহাতে বৃষ্টি পড়িয়া আবার তখনই উড়িয়া যাইত। ভূমিকম্প ক্রমাগতই হইত। সেই ভূমিকম্পের বেগে মাটি ফাটিয়া পৃথিবীর ভিতরকার গলিত জিনিস

ইগুয়ানোডন্।
ত্রিশ ফুট লম্বা নিরামিষভোজী ডাইনোসর। (২৮ পৃষ্ঠা দেখ।)

বাহির হইত। পণ্ডিতেরা বলেন যে, আজও পৃথিবীর ভিতরটা এত গরম রহিয়াছে যে, তাহাতে সকল জিনিসই গলিয়া যায়। মাঝে মাঝে আগ্নেয় পর্ব্বতের ভিতর দিয়া ঐ গলান জিনিস বাহির হয়।

তাহারও পূর্ব্বে পৃথিবী ধোঁয়ার মতন ছিল। তখন সে ঐ সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিত।

বাস্তবিক, সূর্য্যেরও কালে পৃথিবীর দশা হইবে। সূর্য্যটা কি না খুব প্রকাণ্ড, তাই তাহার ঠাণ্ডা হইতে ঢের সময় চাই। এক চাম্‌চে গরম দুধ শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইয়া যায়; কিন্তু এক কড়া' দুধ হইলে তাহা অনেকক্ষণ গরম থাকে। এই জন্য পৃথিবী শীঘ্র শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, আর সূর্য্য এখনও ঠাণ্ডা হইতে পারিতেছে না। চন্দ্র আরো ছোট, তাই সে ইহারই মধ্যে একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

সূর্য্যের প্রায় সমস্তটাই হয়ত এখনও ধোঁয়ার মতন আছে। পৃথিবীর বাহিরের খানিকটা (অনেকে বলেন, প্রায় ৩০।৩৫ মাইল) জমাট বাঁধিয়া একটা খোলার মতন হইয়াছে। ভিতরের অবস্থা কিরূপ, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে স্থির হয় নাই। পূর্ব্বে অনেকে বলিতেন যে নারিকেলের যেমন ভিতরে জল, বাহিরে মালা, পৃথিবীরও তেমনি ভিতরে তরল পদার্থ, আর বাহিরে কঠিন আবরণ। কিন্তু আজকালকার বড় বড় পণ্ডিতদিগের এই মত যে, পৃথিবীর ভিতরে অতিরিক্ত পরিমাণে তরল পদার্থ থাকা খুব সম্ভব নহে। তবে, সে স্থানটা যে অতিশয় গরম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চন্দ্রের আগাগোড়াই জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক এসকল কথায় আমাদের এখন প্রয়োজন নাই। আমরা পৃথিবীর ছেলেবেলার খবর লইতে চলিয়াছিলাম, তাহা কতক পাইয়াছি। এখন খালি একটি কথা বলিলেই উপস্থিত কাজটা শেষ হয়। পৃথিবীতে যত রকমের পাথর আছে তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। পৃথিবীর ভিতরকার গলিত জিনিস বাহিরে আসিয়া কতকগুলি পাথর হইয়াছে। আর পৃথিবীর উপরকার জিনিস ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বা অন্য কোন কারণে বদলাইয়া গিয়া আর কতকগুলি পাথর হইয়াছে। বেলে পাথর, শ্লেট পাথর, খড়ি, কয়লা ইত্যাদি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পাথরের দৃষ্টান্ত। জীব জন্তু বা গাছপালার চিহ্ন যাহা পাওয়া যায়, তাহা এই সকল পাথরেই পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে আগে জন্তু হইয়াছিল, কি গাছপালা হইয়াছিল, এ কথার উত্তর দেওয়া একটু কঠিন; তবে গাছ পালা আগে হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। গাছেরা মাটির রস টানিয়া লইয়াই বাঁচিতে পারে, কিন্তু জন্তুদের পক্ষে খালি মাটির রস চুষিয়া বাঁচিয়া থাকা কঠিন।

গাছই বল, আর জন্তুই বল, পৃথিবীর সেই প্রথম অবস্থায় ইহাদের কাহারই খুব বেশী উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। গাছের মধ্যে নানা রকমের শেওলা, আর জন্তুর মধ্যে নানা রকমের পোকা, ইহারাই পৃথিবীর প্রথম জীব। গুগ্‌লি আর চিংড়ি মাছের জাতীয় জন্তুও প্রায় এই সময়েই দেখা দেয়। তখনকার এক একটা শামুক প্রায়

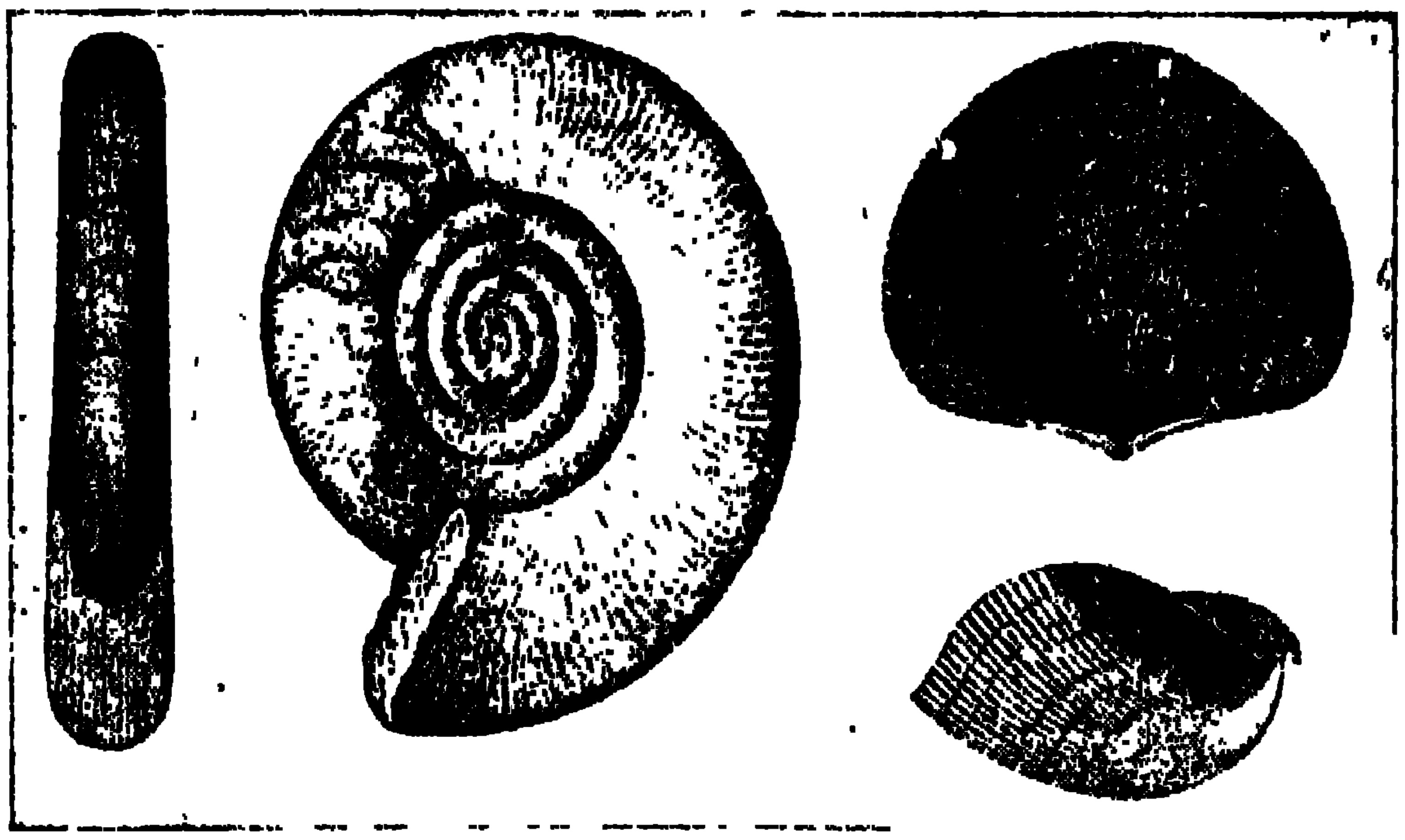

সেকালের শামুক।

এক একটা গাড়ীর চাকার মতন বড় হইত। চিংড়িগুলিও নিতান্ত কম ছিল না। তাহার দুএকটা কোন পুকুরে আছে জানিতে পারিলে, সে পুকুরে নামিয়া কাহারও স্নান করিতে ভরসা হইত কি না সন্দেহ। আধ হাত লম্বা চিংড়িটা জীবিত থাকিলে তাহার কাছে যাইতে ভয় হয়। সুতরাং সেকালের ছয়ফুট লম্বা চিংড়িগুলি যে এক একটা ভয়ঙ্কর জানোয়ার ছিল, ইহাতে আর সন্দেহ কি? ইহাদের বিদ্যাসাধ্যিও কম

ছিল না। কেহ চিৎ হইয়া সাঁতরাইত, কেহ কেন্নোর মতন তাল পাকাইয়া থাকিতে পারিত; কেহ আবার পিছনবাগে হটিয়া গিয়া মাটির ভিতরে ঢুকিতে পারিত।

এ সকল চিংড়ি মাছ যে ঠিক আজ কালকার চিংড়ি মাছের মতন ছিল না, তাহা ছবি দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে। সকলগুলি আবার এই ছবির মতনও ছিল না। আবার, কোন কোন বিষয়ে আজ কালকার বিছুগুলির সঙ্গে ইহাদের খুব সাদৃশ্য দেখা যায়।

চিংড়ির পরে পৃথিবীতে মাছের জন্ম হইয়াছিল। এই সকল মাছের চেহারা কিরূপ ছিল, তাহার নমুনা দেওয়া গেল। একটা দেখিতে কি অদ্ভুত ছিল দেখ। ডানা দুখানি যেন কাঁকড়ার দাঁড়া। শরীরটা একটা শক্ত খোলায় ঢাকা। কেবল লেজটিতে মাত্র যা' একটু মাছের পরিচয় পাওয়া যায়।

শেওলা

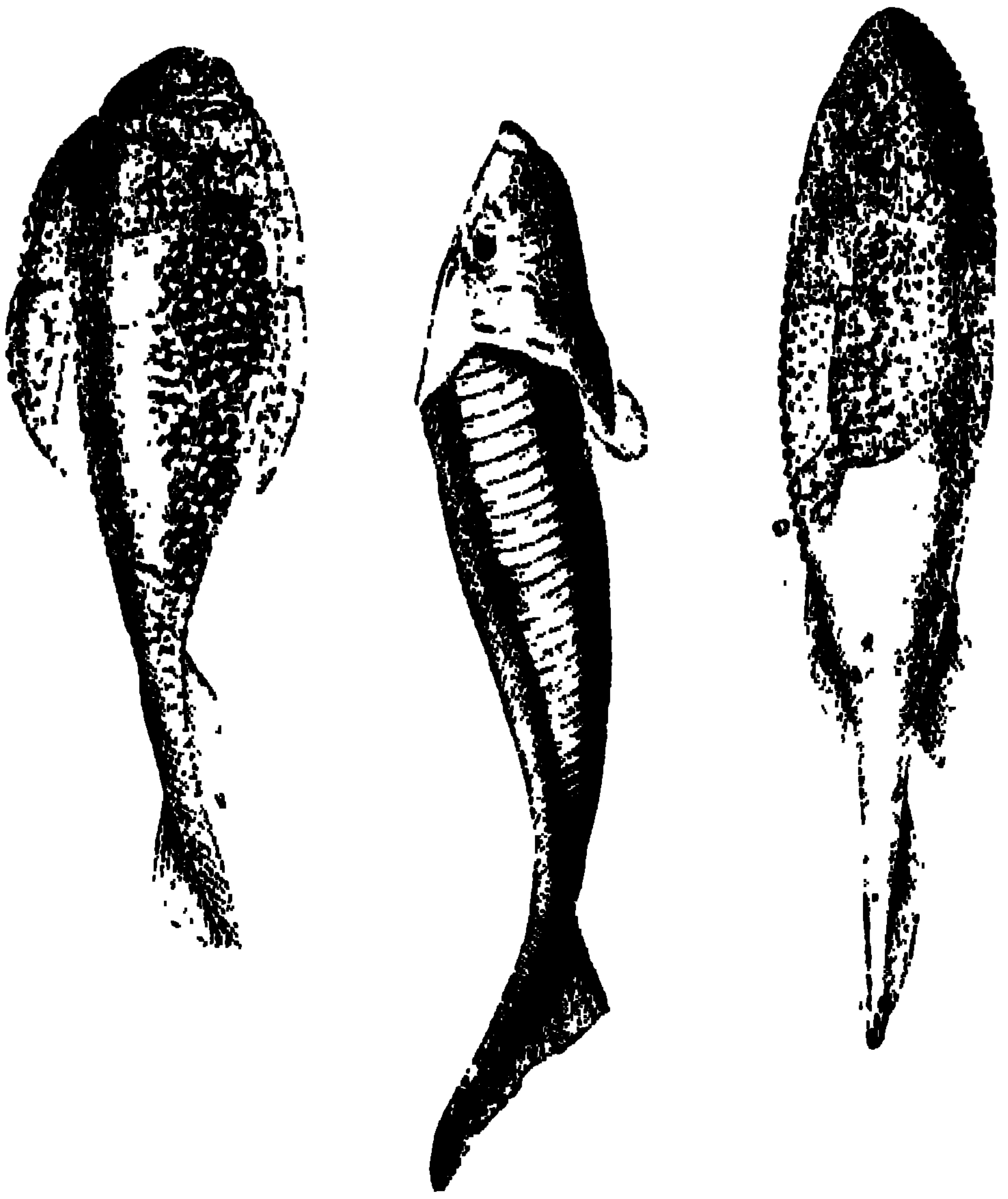

সেকালের মাছ।

এই সময়ে পৃথিবী অবশ্য এখনকার চাইতে বেশী গরম ছিল। পৃথিবীর জলের ভাগের বেশীটা হয়ত মেঘের আকারেই ছিল; সুতরাং আকাশ প্রায়ই মেঘলা থাকিত; সেই মেঘের ভিতরে সূর্য্যের আলো সহজে প্রবেশ করিতে পাইত না। আজ কাল যেমন পৃথিবীর মাঝখানটা খুবই গরম, আর উত্তর দক্ষিণ খুবই ঠাণ্ডা, সেকালে তেমন ছিল না

বলিয়াই বোধ হয়। তখন আগাগোড়াই প্রায় এক ভাবের গরম ছিল। বড় বড় সমুদ্র ছিল, কিন্তু তাহা বেশী গভীর ছিল না। ডাঙ্গা নীচু ছিল, মাটি স্যাঁৎসেতে ছিল।

স্যাঁৎসেতে গরম মাটি পাইয়া গাছ পালা খুবই বাড়িয়াছিল। তখনকার বনগুলির মতন গভীর বন হয়ত আজকাল দেখা যায় না। তখনকার গাছপালা দেখিতে বেশ সুন্দরই ছিল, আর খুব বড়ও হইত। যে সকল গাছের ছবি দেখিতেছ, তাহাদের এক একটা ত্রিশ চল্লিশ ফুট হইতে প্রায় একশত ফুট উচু হইত। কিন্তু আমাদের আজকাল-কার তুলনায় এ সকল গাছ অতি নিম্নশ্রেণীর ছিল। ইহাদের না হইত ফুল, না হইত আমাদের আম কাঁঠালের ন্যায় মিষ্ট মিষ্ট ফল। দেখিতে বড় ছিল, কিন্তু ভিতরে সার, অর্থাৎ যাহাকে 'কাঠ' বল তাহা, ছিল না।

সেকালের বন।

বাস্তবিক এ সকল বন নিতান্তই অদ্ভুত ছিল। ফুল নাই, ফল নাই, পাখীর গান নাই। গাছগুলি খালি ছাল আর ছোবড়া; তাহাতে চড়িয়া যে একটু আমোদ করিবে তাহারও যো নাই। পোকা ফড়িঙ্গের অভাব ছিল না। এই সকল বনের ভিতরে একটা ফড়িং পাওয়া গিয়াছে, তাহার ডানা মেলিলে চৌদ্দ ইঞ্চি চওড়া হয়।

আমি বলিতেছিলাম, "এই সকল বনের ভিতরে এক রকম ফড়িং পাওয়া গিয়াছে"। তবে কি সে সব বন আজও আছে না কি?

হাঁ, আছে বৈ কি,—কিন্তু তাহা মাটির নীচে। সে সকল গাছকে আর এখন গাছ বলিয়া চিনিতেই পারিবে না,—তাহারা কয়লা হইয়া গিয়াছে।

যে পাথুরে কয়লা রাণীগঞ্জ, বরাকর, গিরিডি ইত্যাদি অঞ্চল হইতে মাটি খুঁড়িয়া তুলিতে হয়, যাহাতে রান্না হয়, রেল চলে, গ্যাস্ তয়ের করে,—তাহা যে আবার এককালে প্রকাণ্ড বন ছিল, একথা কি সহজে বিশ্বাস হয়? কিন্তু একটিবার স্বচক্ষে দেখিলে আর বিশ্বাস না করিবার যো থাকে না। গাছের ডাল, গাছের পাতা, গাছের গুঁড়ি, গাছের শিকড়—সমস্তই সেখানে দেখিতে পাইবে। কোন কোন খনিতে ডালপালা শিকড় শুদ্ধ আস্ত গাছ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। গাছ আর এখন গাছ নাই—সে কয়লা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহার গঠন অবিকল রহিয়াছে।

এরূপ মনে করিও না যে, একটা কয়লার খনিতে ঢুকিলেই সেকালের গাছ পালাগুলিকে তোমার চোখের সামনে খাড়া দেখিতে পাইবে। আমাদের চোখের সামনে অনেক জিনিসই থাকে, কিন্তু দেখিতে না জানিলে আমরা তাহার ক'টিকে দেখিতে পাই? আমি যখন কয়লার খনি দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন খনির একটি বাবু অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সব দেখাইতেছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কয়লা খুঁড়িবার সময় তাঁহাদের লোকেরা কোন গাছ পালার চিহ্ন পায় কি না? এই কথার উত্তরে বাবুটি বলিলেন যে, ওরূপ কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। অথচ ঐ সকল খনি হইতে ঐরূপ অনেক গাছের চিহ্ন আনিয়া এখানকার যাদুঘরে রাখা হইয়াছে। দুই তিন শত হাত মাটির নীচে অন্ধকারের ভিতরে মুটেরা কয়লা খোঁড়ে। দিনমানের মধ্যে যত কয়লা তুলিতে পারিবে ততই তাহারা বেশী পয়সা পাইবে, এই কথাই তখন তাহারা ভাবে। সেই কয়লার ভিতরে আবার কোন গাছ পালার চিহ্ন থাকিতে পারে, এত কথা তাহারা জানেও না জানিলেও ঐ অন্ধকারের ভিতরে তাহা সহজে চোখে পড়ে না; চোখে পড়িলেও, তিন ঘণ্টা ধরিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া সেটুকুকে আস্ত বাহির করিবার অবসর তাহাদের হয় না। তাহারা ত আর পণ্ডিত নহে, যে সেকালের খবরটা তাহাদের না লইলেই নয়!—তাহারা গরীব লোক, পেটের দায়ে কয়লা খুঁড়িতে আসিয়াছে। সুতরাং খনিতে গাছ পালার চিহ্ন থাকিলেও তাহারা তাহা দেখিতে না পাইয়া কোদ্‌লাইয়া গুঁড়া করিয়া দেয়। এই জন্যই কয়লার খনির লোকেরা ইহার কোন খবর রাখে না।

কিরূপ করিয়া এত বড় বড় বন শেষে পাথুরে কয়লা হইল, আর কিরূপ করিয়াই বা তাহা এত মাটির নীচে চাপা পড়িল, এরূপ হইতে না জানি কতদিন লাগিয়াছিল, এ সকল কথা ভাবিতে গেলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। পণ্ডিতেরা বলেন যে, যাট ফুট পুরু কয়লার

থাক্ হইতে লক্ষ বৎসরেরও অধিক সময় লাগে। ষাট ফুট কয়লা অনেক খনিতেই আছে; কোন কোন খনিতে প্রায় ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ কয়লা পাওয়া গিয়াছে। ইহার পর যদি একথা ভাবিয়া দেখা যায় যে, এই এক শত কুড়ি ফুট কয়লার সমস্তটা এক সময়ে হয় নাই, তাহা হইলে মানিতে হয় যে, এই পরিমাণ কয়লা হইতে দুই লক্ষ বৎসরের অনেক বেশী সময় লাগিয়াছিল। একটা কয়লার খনিতে মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, সেখানে এক থাক্ কয়লা, এক থাক্ মাটি, এইরূপ করিয়া প্রায় এক শত থাক্ কয়লা আছে! কেবল কয়লা মাপিলে এক শত কুড়ি ফুট হয়, আর মাটি আর কয়লা এক সঙ্গে করিয়া মাপিলে দশ হাজার ফুটেরও বেশী হয়। এত কয়লা আর মাটি জমিতে কত লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

শুধু কি কত লক্ষ বৎসর? কত গাছ পালা পচিয়া এত কয়লা হইতে পারে, তাহাই একবার ভাবিয়া দেখ না। ষোল ফুট কয়লা হইতে প্রায় তিন শত ফুট গাছ পালার দরকার হয়। এক শত ফুট কয়লা হইতে যে গাছ পালা চাই তাহাতে প্রায় দুই হাজার ফুট উচু পাহাড় হয়! এত গাছ পালা যাহাতে ছিল সে সকল বন না জানি কত প্রকাণ্ড ছিল।

গাছ পালা জলের নীচে পচিতে পচিতে গরম আর চাপ পাইয়া শেষটা কয়লা হইয়াছে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গাছ পালাকে এইরূপ অবস্থায় পচাইতে পারিলে, তাহা পাথুরে কয়লা হইয়া যায়। মাটি যে অনেক স্থলে একটু একটু করিয়া উচু নীচু হয় তাহা বোধ হয় তোমরা জান। পৃথিবীর অনেক স্থলেই এরূপ হইতেছে। সেকালে এই ব্যাপারটা আরো বেশী হইত। তখন একটা প্রকাণ্ড বন জলে ডুবিয়া যাওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। আর কয়লা হইবার সময় যে এরূপ ঘটনা হইয়াছে, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। কয়লার ভিতরে যে সকল জিনিস আছে, গাছ পালা জলের নীচে পচিয়া তাহা জন্মিয়া থাকে। খনিতে এক এক থাক্ কয়লার উপরে এবং নীচে এক এক থাক্ মাটি থাকে; সে মাটি, আর পুকুর, বিল ইত্যাদির তলার কাদা একই জিনিস। ঘোলা জল থিতাইয়া ঐ রূপ মাটি উৎপন্ন হয়।

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এক একটা বন পচিয়া এক এক থাক্ কয়লার জন্ম হইয়াছিল। মাটি নীচু হইয়া যাওয়াতে হয়ত একটা বন জলে ডুবিয়া গেল। সেই জল থিতাইয়া পলি পড়িয়া (ঘোলা জলে মিশান কাদা তলায় পড়িয়া যাওয়ায় নাম 'পলি' পড়া) সেই বন ঢাকা পড়িল। আবার কালে হয় ত সেই জায়গাটা উচু হওয়াতে পুনরায় সেখানে শুক্‌নো মাটি হইল; তাহার উপরে আবার বন হইল; আবার তাহা ডুবিয়া গেল। এইরূপ করিয়া যে এক এক থাক্ কয়লা আর এক এক থাক্ মাটি ক্রমে সঞ্চয় হইতে পারে তাহা

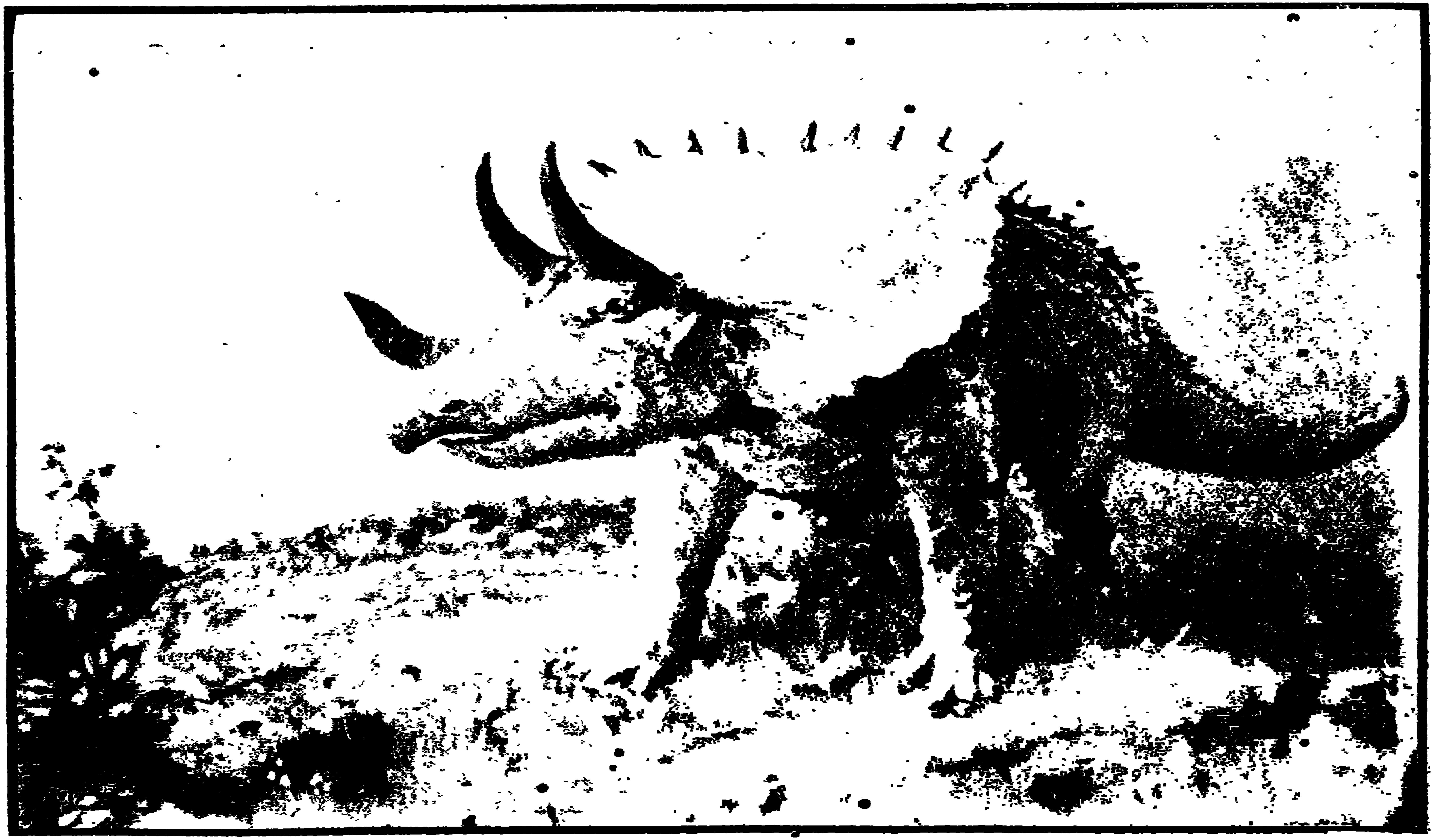

ট্রাইসিরেটপ্স.।

শং ৩ মিষভোজী ডাইনোসর। ২৫ ফুট লম্বা ছিল পৃষ্ঠ

সহজেই বুঝা যায়। ইহার উপরে যখন দেখি যে অনেক সময় এক একটা মাটির থাকে তাহার উপরকার গাছ পালার শিকড়গুলি পাওয়া যায়, তখন আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না।

ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে বেলে পাথরের পাহাড় আছে। এইপাথরে মাঝে মাঝে এক প্রকার অদ্ভুত জন্তুর পায়ের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দাগগুলি কতকটা মানুষের হাতের দাগের মতন। এ জন্য এই জন্তুর নাম কাইরোথীরিয়ম্ (হস্ত জন্তু) রাখা হইয়াছে। ইহার দাঁতের ভিতরকার গঠন অত্যন্ত জটিল বলিয়া ইহার আর এক নাম ল্যাবিরিন্থোডন্ (জটিল দন্ত)। এই জন্তু প্রায় ষাঁড়ের মতন বড় হইত। ইহার হাড়ে ব্যাঙের লক্ষণও আছে, কুমীরের লক্ষণও আছে, স্তন্যপায়ী জন্তুর লক্ষণও আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার মাথার হাড় দেখিয়া অনেকে সন্দেহ করেন যে ইহার কপালে হয়ত একটি ছোট অতিরিক্ত চক্ষু ছিল।

ডর্সেট্‌সায়ারের পাথরে অনেক প্রাচীন জন্তুর চিহ্ন পাওয়া যায়। সেই সকল চিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করিয়া বিক্রয় করিলে, যে পয়সা পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা অনেকের দিন চলে। একটি মেয়ে এইরূপ করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিত। ১৮১১ সালে একদিন সেই মেয়েটি প্রাচীন জন্তুর চিহ্ন খুঁজিতে গিয়া দেখিল যে, একটা জন্তুর হাড় পাহাড়ের গা হইতে খানিক বাহির হইয়া আছে। আর একটু খুঁজিয়া সে দেখিতে পাইল যে, ঐ হাড়গুলি একটা মস্ত জন্তুর কঙ্কালের অংশ। তখন সে সেই স্থানের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া সমস্তটা কঙ্কাল বাহির করিল। তারপর মুটে ডাকিয়া পাথরশুদ্ধ সেই কঙ্কালটাকে খুঁড়িয়া তোলা হইল।

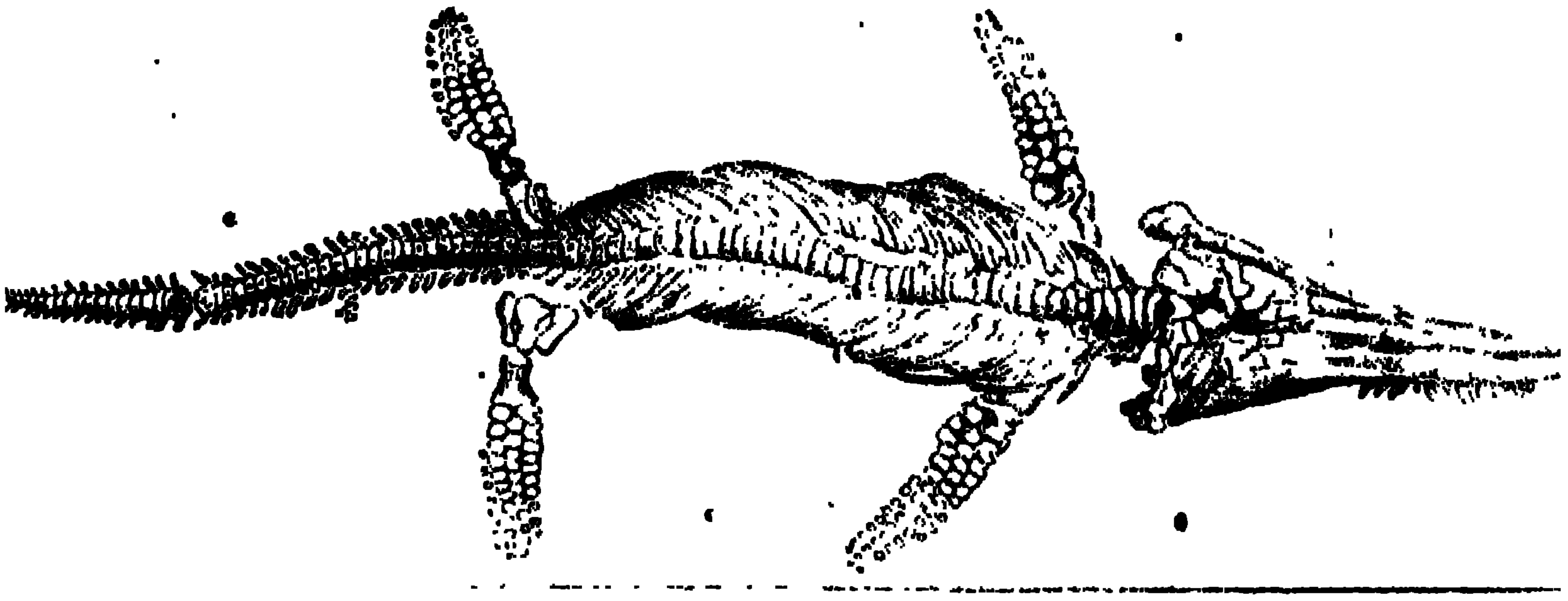

ইক্‌থিয়োসরসের কঙ্কাল।

এই কঙ্কাল যে জন্তুর, সেটা ত্রিশ ফুট লম্বা ছিল। ইহার পরে এই জাতীয় জন্তুর আরও কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে; তাহার কোন কোনটা প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা। ইহার গঠন কোন কোন বিষয়ে মাছের মতন, কোন কোন বিষয়ে গোসাপ আর কুমীরের মতন। এই জন্য ইহার নাম ইক্‌থিয়োসরস্, ("ইক্‌থিয়স্" মাছ; "সরস্" কুমীর, গোসাপ ইত্যাদি জাতীয় জন্তু) বা 'মাছ কুমীর' রাখা হইয়াছে।

ইহার মেরুদণ্ডের হাড় মাছের হাড়ের মতন ছিল। মাথা কুমীরের মতন। হাত পা নৌকার দাঁড়ের মতন, অর্থাৎ খালি একটা চ্যাটাল মাংসল জিনিস, তাহাতে আঙ্গুল নাই —অথচ তাহা মাছের ডানার মতনও নহে। তিমির ডানা ঠিক এইরূপ থাকে।

ইক্‌থিয়োসরস্ যে সময়ে পৃথিবীতে ছিল, তখন তাহার সমকক্ষ আর কোন জন্তু ছিল না। তাহার ৩ ইঞ্চি লম্বা দেড় শত দুই শত ভয়ানক দাঁত দিয়া সে একটি বার

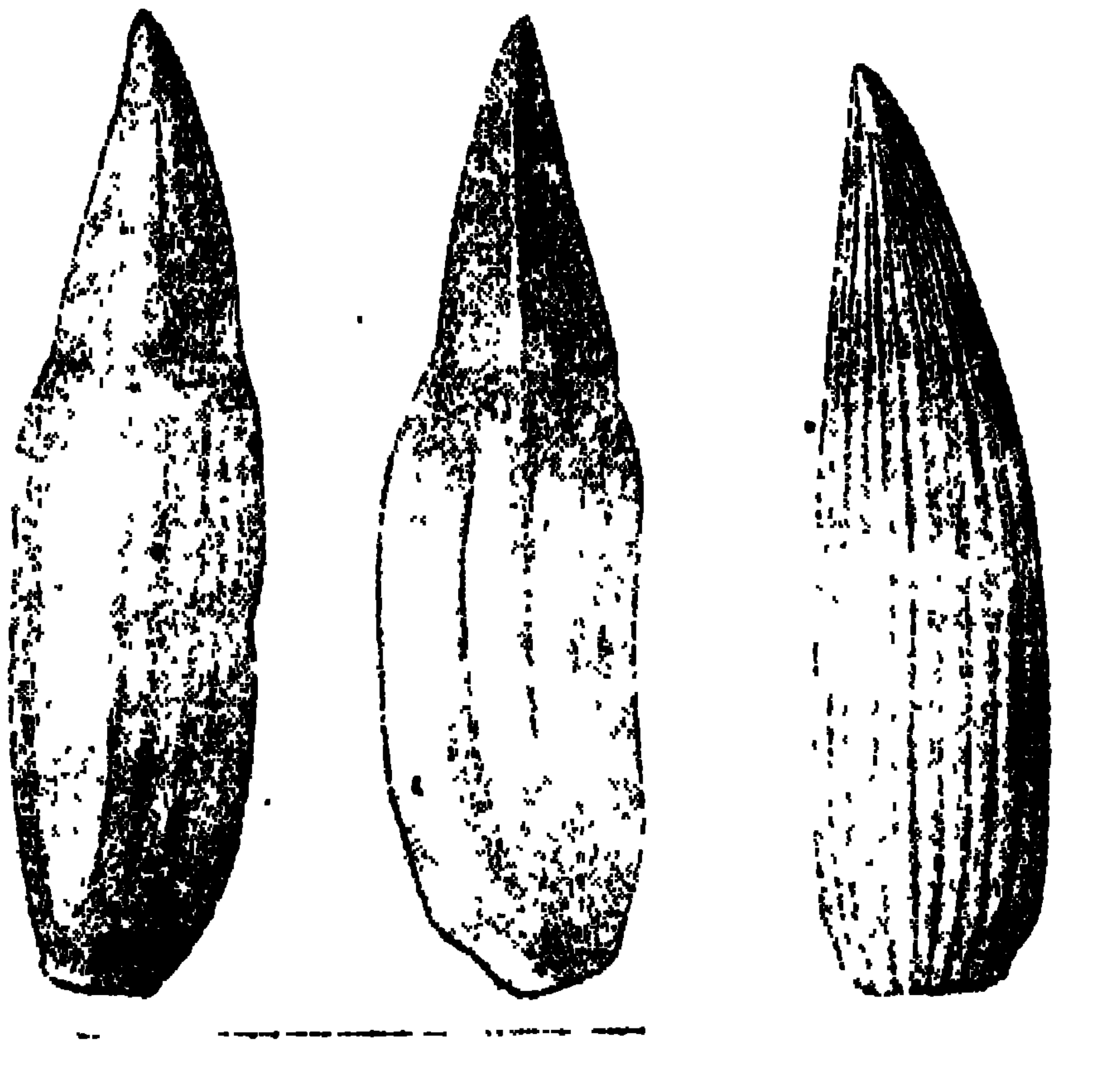

ইক্‌থিয়োসরসের দাঁত।

ষ্টিগো সরস্‌।

২৫ ফুট লম্বা নিরামিষখেকো ডাইনোসর। ইহার দুইটা মস্তিক ছিল। (২৯ পৃষ্ঠা দেখ।)

যাহাকে ধরিত, তাহার আর রক্ষা ছিল না। নৌকার দাঁড়ের মতন ঐ চারি খানি পা আর ঐ লেজটির সাহায্যে সে জলের ভিতরে না জানি কিরূপ ভয়ানক বেগে ছুটিতে পারিত! পলাইয়া তাহাকে এড়াইবার ভরসা খুব কমই ছিল। তার পর তাহার চোখ দুটি। বড়

ইক্‌থিয়োসরসের মাথা। চোখের গর্ত্তটা কত বড় দেখ!

একটা ইক্‌থিয়োসরসের চোখের গর্ত্ত প্রায় চৌদ্দ ইঞ্চি চওড়া হইত! এত বড় চোখ দিয়া সে আমাদের চেয়ে ঢের বেশী দেখিতে পাইত, তাহাতে সন্দেহ কি? এই চোখের গঠন আবার এমনি যে, তাহা দ্বারা ইচ্ছামত দূরবীক্ষণ অথবা অণুবীক্ষণের কাজ চলে। নিতান্ত ছোট জন্তু আর ঢের দূরের জন্তুকেও সে বেশ পরিষ্কার দেখিত।

ইহারা কখনও ডাঙ্গায় উঠিত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইহাদের পায়ের গঠন দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহা দিয়া নৌকার দাঁড়ের কার্য্যই বেশী হইত; ওরূপ পা লইয়া ডাঙ্গায় চলা নিতান্ত সহজ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে মাঝে মাঝে ডাঙ্গায় উঠিয়া রোদ পোহানটা বোধ হয় চলিত। নিশ্বাস লইবার জন্য ইহারা কুমীরের মতন এক একবার ভাসিয়া উঠিত।

ইক্‌থিয়োসরসেরা হয়ত মাছই বেশী খাইত। অনেক ইক্‌থিয়োসরসের পেটের ভিতরে খুব ছোট ছোট ইক্‌থিয়োসরসের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, হয়ত ক্ষুধার সময় অন্য জন্তু না মিলিলে, নিজের বাচ্ছাগুলিকে ধরিয়া গিলিতে তাহাদের বেশী আপত্তি ছিল না। আবার অনেকে বলেন, ইক্‌থিয়োসরসের মৃত্যুর সময়ে তাহার পেটে যে বাচ্ছা ছিল, ওগুলি তাহাদেরই কঙ্কাল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ কঙ্কাল কেবল এক জাতীয় ইক্‌থিয়োসরসের পেটের ভিতরেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, অন্য ইক্‌থিয়োসরসেরা ডিম পাড়িত, আর এই জাতীয় ইক্‌থিয়োসরসগুলির বাচ্ছা হইত।

এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে বোধ হয় যেন ইক্‌থিয়োসরসদের হঠাৎ মৃত্যু হয়, আর মৃত্যুর পরেই তাহারা মাটি চাপা পড়ে। কিরূপ ভয়ানক দুর্ঘটনায় এরূপ হইয়াছিল, তাহা এখন ঠিক করিয়া বলা সহজ নহে।

ইক্‌থিয়োসরস্‌ এই সময়ের জন্তুদের মধ্যে সকলের চাইতে ভয়ানক ছিল বটে, কিন্তু এই সময়ের সকলের চাইতে আশ্চর্য্য জন্তুর কথা বলিতে হইলে, আর একটি জন্তুর উল্লেখ করিতে হয়। ইহার নাম প্লীসিয়োসরস্‌। "প্লীসিয়স্‌" বলিতে কাছাকাছি অথবা অনুরূপ বুঝায়। এই জন্তুর শরীরের গঠন, ইক্‌থিয়োসরসের তুলনায়, অনেকটা গোসাপ আর কুমীরের কাছাকাছি ছিল।

এ জন্তুটা নিতান্তই অদ্ভুত ছিল। গোসাপের মুখ, কুমীরের দাঁত, সাপের গলা, তিমির ডানা। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহার চেহারা দেখিলে হঠাৎ মনে হয়, যেন একটা সাপের গায় একটা কচ্ছপকে গাঁথিয়া দিয়াছে!

খুব বড় প্লীসিয়োসরস্‌গুলি প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা হইত বটে, কিন্তু ইহারা ইক্‌থিয়োসরসের ন্যায় ভয়ানক জন্তু ছিল বলিয়া বোধ হয় না। গড়ন হালকা, গায় জোর কম, হাত পা তেমন বেগে ছুটিবার উপযোগী নহে, যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্রও সামান্যই বলিতে হইবে। সুতরাং ইহাদিগকে সকল বিষয়েই ইক্‌থিয়োসরস্‌ অপেক্ষা নিকৃষ্ট দেখা যাইতেছে। হয়ত ইহারা ইক্‌থিয়োসরস্‌কে বড়ই ভয় করিয়া চলিত, আর তাহাকে দেখিতে পাইলে অবিলম্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিত।

অল্প জলে ঝোপ জঙ্গলের ভিতরে গা ঢাকা দিয়া থাকাকেই প্লীসিয়োসরস্‌ অধিক নিরাপদ মনে করিত বলিয়া বোধ হয়। তাই বুঝি ঈশ্বর তাহাকে দয়া করিয়া বকের মতন লম্বা গলা দিয়াছিলেন—যেন শিকার কাছে আসিলেই ঐ গলাটি বাড়াইয়া খপ্‌ করিয়া তাহাকে ধরিতে পারে।

ইক্‌থিয়োসরসের ন্যায় ইহাদেরও ডাঙ্গায় চলার ক্ষমতা কম ছিল—হয়ত ছিলই না। জলের ভিতরেও খুব গভীর স্থানে চলা ফেরা করা অপেক্ষা অল্প জলে থাকিতেই ইহাদের সুবিধা হইত। অনেক সময় হয়ত ইহারা হাঁসের মতন গলা বাঁকাইয়া জলের উপরে সাঁতরাইত।

ইক্‌থিয়োসরস আর প্লীসিয়োসরস অনেক রকমের হইত। কোনটা বড়, কোনটা ছোট, কোনটার মাথা ভারি, কোনটার গলা মোটা, কোনটার ঠোঁট লম্বা। সুতরাং তখনকার সমুদ্র যে নানা জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল, একথা সহজেই বুঝা যাইতেছে; নহিলে এতগুলি মাংসাশী জন্তু কি খাইয়া বাঁচিত?

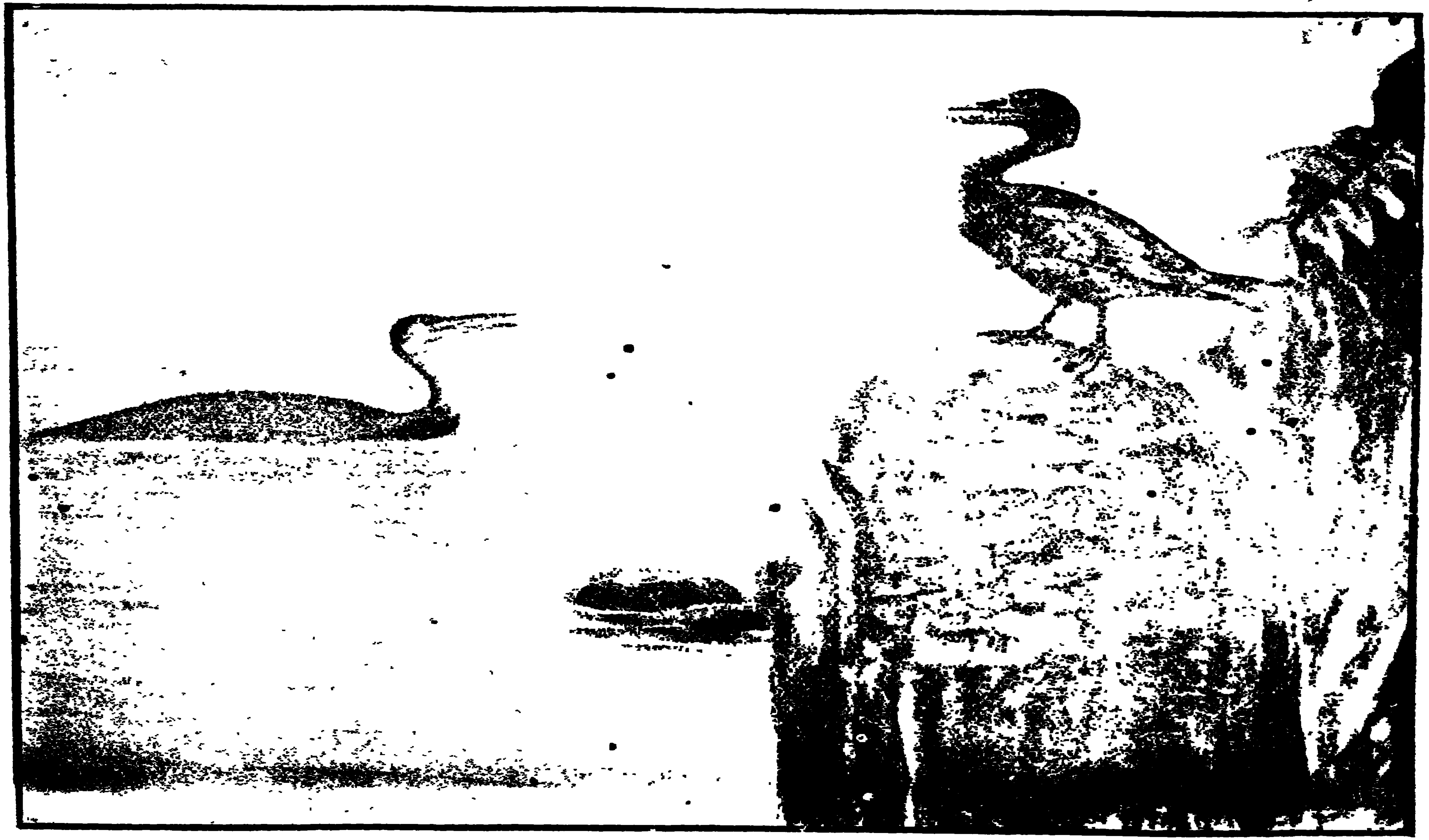

হেস্পারর্নিস্। ইক্‌থি-অর্নিস।

সেকালের পাখী। (৩২ পৃষ্ঠা দেখ।)

কোথায় কুমীর, আর কোথায় পাখী! কিন্তু পণ্ডিতদের অনেকে বলেন যে, কুমীর হইতেই পাখীর সৃষ্টি হইয়াছে! অন্ততঃ একথা নিশ্চয় যে, সেকালের কুমীরগুলির ভিতরে অনেক স্থলে পাখীর লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়। পিছনের পা, আর কোমরের হাড়গুলির গঠন আজকালকার উট পাখীগুলির কোমরের হাড় আর পায়ের গঠনের সঙ্গে আশ্চর্য্যরূপে মিলে।

চলিবার সময় ইহাদের সকলে না হইলেও, অন্ততঃ অনেকে, পাখীর মতন শুধু পিছনের পায় ভর দিয়াই চলিত। সামনের পা দুখানি পিছনের পায়ের চাইতে ঢের ছোট ছিল; সে দুখানিকে তাহারা পাখীর ডানার মতন করিয়া বুকের কাছে গুটাইয়া রাখিত।

পায়ের আঙ্গুলগুলি অনেক স্থলে ঠিক পাখীর আঙ্গুলের মতন ছিল। চলিবার সময় তাহাদের পায়ের যে দাগ হইত, তাহাও ঠিক পাখীর পায়ের দাগের মতন। এই সকল দাগ দেখিয়া প্রথমে লোকে পাখীর পায়ের দাগই মনে করিয়াছিল; এবং এই কথা লইয়া দিন কয়েকের জন্য পণ্ডিত মহাশয়েরা বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলেন। চিন্তার বিষয় হইল এই যে, পৃথিবীতে এ সময়ে পাখী ছিল না, অথচ এত বড় বড় পাখীর পায়ের দাগ কোথা হইতে আসিল? কোন কোন স্থলে প্রায় ২০ ইঞ্চি লম্বা দাগ দেখা গিয়াছে; আর তাহার এক একটা দাগ প্রায় ৫ ফুট অন্তর পড়িয়াছে।

যাহা হউক এগুলি যে পাখীর পায়ের দাগ নয়, দু একটা জানোয়ারের হাড় আবিষ্কার হইলেই তাহা জানা গেল।

এই সকল জন্তুকে সাধারণ ভাবে একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া মোটের উপর তাহাদের নাম "ডাইনোসর্" রাখা হইয়াছে। ডাইনোসর্ শব্দের অর্থ 'ভয়ানক কুমীর'। কুমীর

বলিলেই আমরা তাহাকে যথেষ্ট ভয়ানক মনে করি ; তাহার উপর আবার ভয়ানক কুমীর ! সেটা যে কতখানি ভয়ানক ছিল একবার কল্পনা কর। সাধারণ কুমীরগুলি হাজার ভয়ানক হইলেও তাহারা হামাগুড়ি দিয়া চলে আর জল ছাড়িয়া বেশী দূরে যাইতে পারে না। কিন্তু একটা ডাইনোসর্ আসিলে সে দশ বারো মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিতে কিছুমাত্র আপত্তি করিবে না; আর একটিবার সাক্ষাৎ পাইলে তোমারই মতন দু পায়ে ছুটিয়া তোমাকে তাড়া করিবে ইহার উপর যদি সে একটা হাতীর মতন, কি তাহার চাইতেও বড় হয়, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া ঘাড়ে পড়িবার বদ অভ্যাসটাও তাহার থাকে, তবে ব্যাপারখানা কি রকম দাঁড়ায়, বুঝিতেই পার। বড় ভাগ্য যে এরা এখন আর পৃথিবীতে নাই।

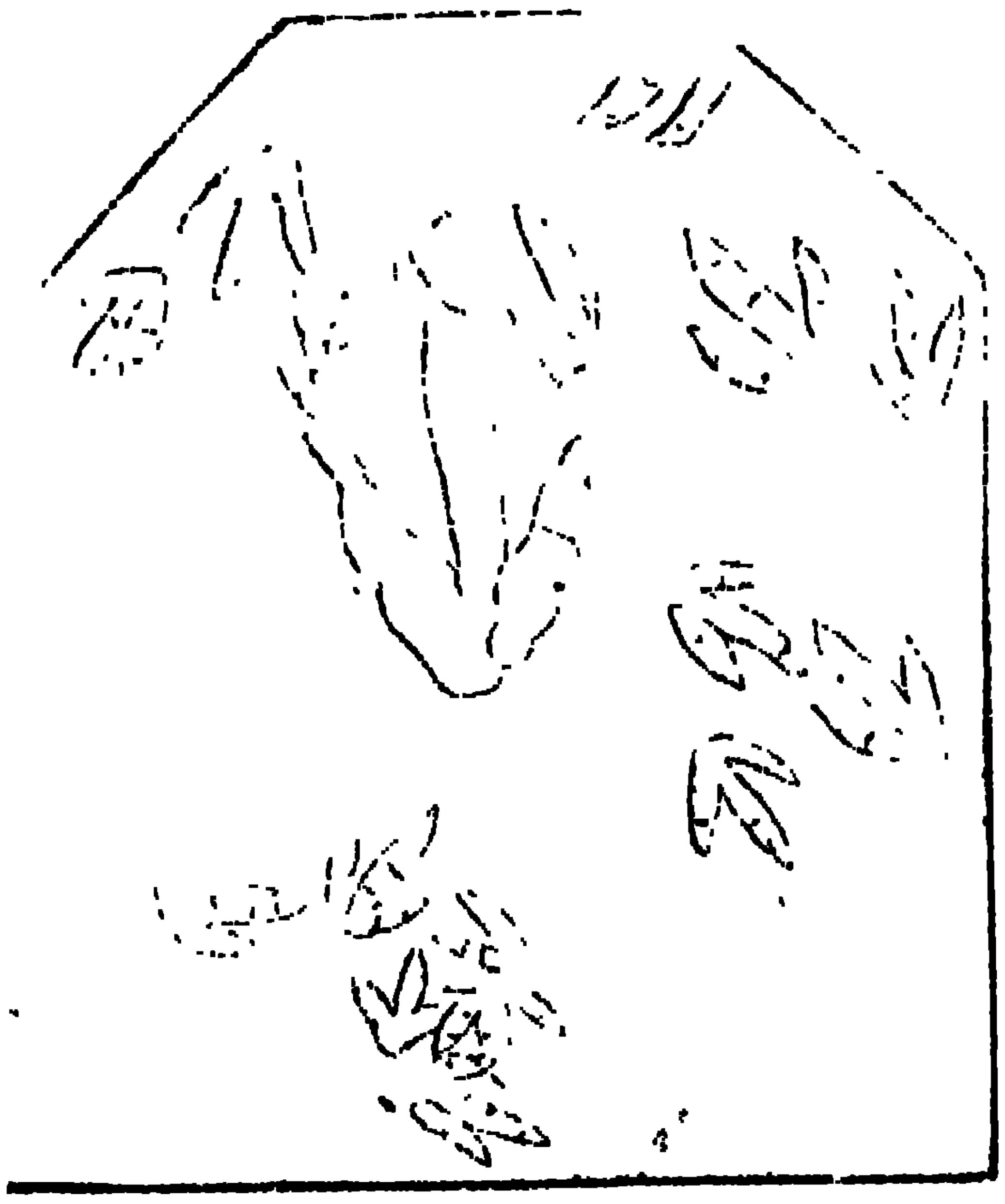

ডাইনোসরের পায়ের দাগ।

যাহা হউক, সকল ডাইনোসরই যে খুব ভয়ানক ছিল তাহা নহে। একে ত ইহাদের সকলগুলি এত বড় হইত না ; তাহার উপর আবার খুব প্রকাণ্ডগুলিরও অনেকে নিরামিষ-ভোজী নিরীহ জন্তু ছিল।

সকলের চাইতে বড় যে ডাইনোসরের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই শ্রেণীর নিরীহ জন্তু। ইহার নাম "ব্রণ্টোসরস্" অর্থাৎ বজ্রকুম্ভীর। তিমি ভিন্ন এত বড় জন্তু আর পৃথিবীতে নাই। এই জন্তু চলিবার সময় নিশ্চয় মাটি কাঁপিত, আর তাহার পায়ের ধুপ্ ধাপ্ শব্দ অনেক দূর হইতে শুনা যাইত। আজকালকার এই একটা টিক্‌টিকি কেমন ট্যাক্ ট্যাক্ শব্দ করে। ব্রণ্টোসরসের তেমন শব্দ করার অভ্যাস থাকিলে, সে শব্দ যে বাজপড়ার শব্দের চাইতে কম হইত, তাহা বোধ হয় না। একটা হাতী চ্যাচাইলে তাহা দুই তিন মাইল দূর হইতে শুনা যায়। ব্রণ্টোসরস্ তেমন চ্যাচাইলে হয়ত দশ মাইলের কম তাহার আওয়াজ যাইত না।

১০৭৫৯৭/১৮ ১-১০-১৯১০

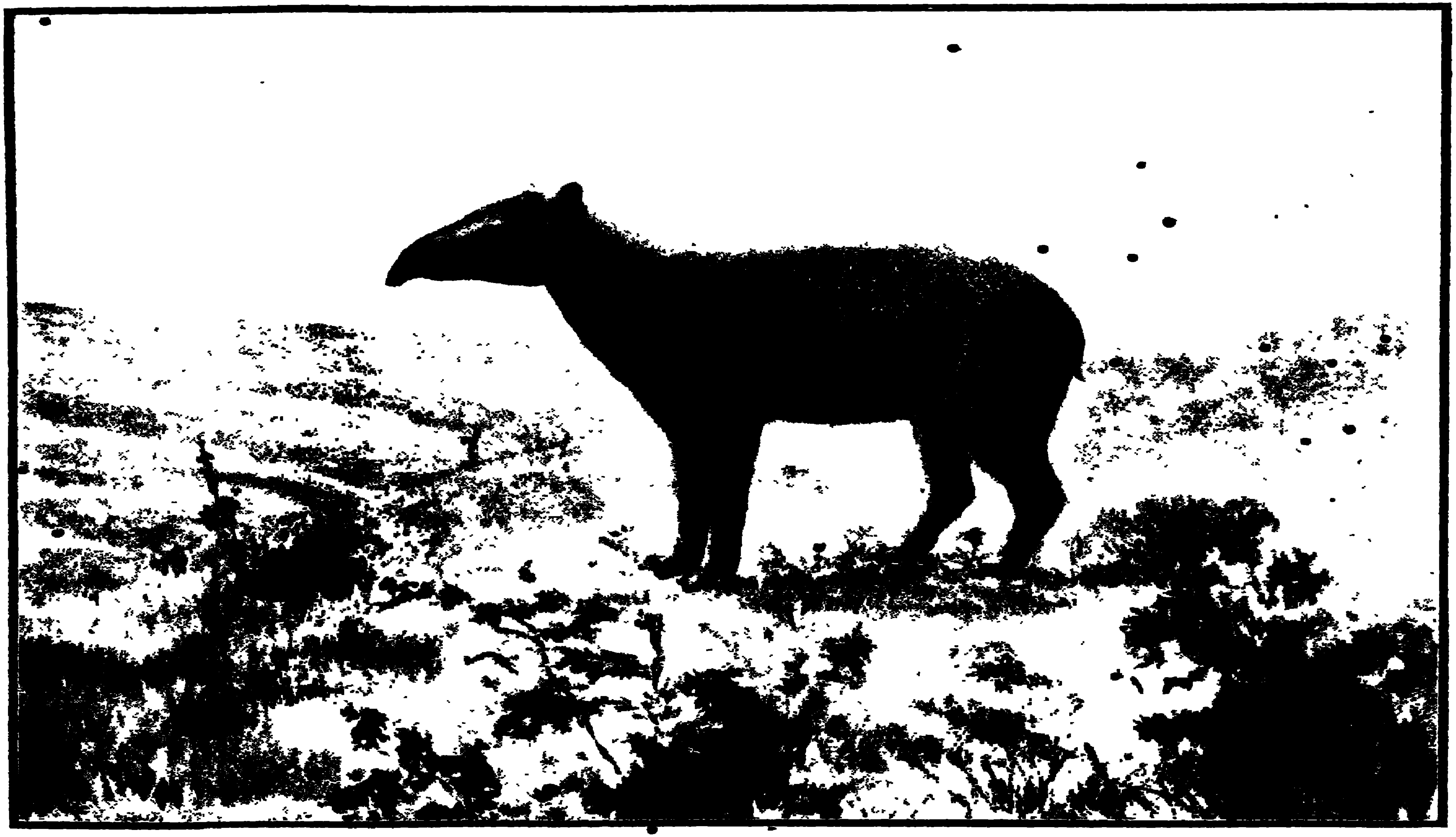

প্যালিয়োথীরিয়ম্।

টেপির জাতীয় নিরামিষভোজী সেকালের জন্তু। (৬০ পৃষ্ঠা দেখ।)

কয়েক বৎসর হইল, আমেরিকার "ইয়োমিং" নামক প্রদেশে একটা ব্রণ্টোসরসের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এই কঙ্কাল ১৫৬ ফুট লম্বা। ইহার ওজন প্রায় পৌনে ছয় শত মণ। আস্ত জন্তটা দেড় হাজার মণের কম ভারি ছিল না। তাহার পাঁজরের ভিতরে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোকের স্থান হয়।

পিছনের পায় ভর দিয়া চলার অভ্যাস ইহার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে বেজী যেমন এক একবার হাত গুটাইয়া উঠিয়া বসে, ব্রণ্টোসরসেরও হয়ত মাঝে মাঝে ঐরূপ করিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিবার অভ্যাস ছিল। উঁচু গাছের কচি পাতাগুলি খাইতে হয়ত মাঝে মাঝে তাহার লোভ হইত। তাহা ছাড়া আশে পাশে ভয়ানক শক্রর বাস, তাহাদের কোন্‌টা কোন্ দিক হইতে আসিয়া আক্রমণ করে, তাহার ঠিকানা ছিল না। সুতরাং এক একবার চারিদিক দেখিয়া লইবার প্রয়োজনও ছিল।

ব্রণ্টোসরস্ উঠিয়া বসিলে প্রায় ১০০ ফুট উঁচু হইত। আজকালকার প্রকাণ্ড তাল গাছ আর নারিকেল গাছগুলির আগা খুঁটিয়া খাওয়া তাহার পক্ষে নিতান্তই সোজা কাজ ছিল, বলিতে হইবে। ঐ ছোট মাথাটি শুদ্ধ তাহার ঐ সরু লম্বা গলাটি, গলি ঘুচির ভিতরে অনেক দুর অবধি ঢুকাইয়া সে নিশ্চয়ই অতি সহজে খাবার জিনিস খুঁজিয়া আনিতে পারিত।

এত বড় জানোয়ারের পক্ষে তাহার মাথাটি একটু বেশী ছোট বলিতে হইবে; তাহার ভিতরে মস্তিষ্ক খুব বেশী থাকা অসম্ভব। বাস্তবিক বুদ্ধিটা একটু মোটা গোছের ছিল বলিয়াই বোধ হয়। আজ কাল নিরীহ লোক বলিলেই তোমরা বেকুব বুঝিয়া লও। সেকালেও এই দস্তুরটা কতক ছিল দেখিতেছি। অস্ত্র শস্ত্র তাহার শরীরে কিছু ছিল না বলিলেও হয়; বড় বড় নখ দাঁতওয়ালা মাংসখেকো ডাইনোসর্ গুলির হাত এড়াইবার জন্য তাহার পলায়ন ভিন্ন আর উপায় দেখা যায় না। এখনকার তিমিগুলিরও কতকটা এইরূপ দশা। তিমির জাতীয় ছোটছোট হিংস্র জানোয়ারদের ভয়ে তিমি সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকে। তিমিকে দেখিতে পাইলেই উহারা আসিয়া তাহাকে কামড়াইয়া খাইতে আরম্ভ করে। ব্রণ্টোসরসেরও এইরূপ প্রতিবেশী গুটিকতক ছিল। ইহাদের ভয়ে হয়ত অনেক সময়ই বেচারী জলে নামিয়া গা ঢাকা দিয়া থাকিত। সেখানে গাছ পালারও অভাব ছিল না; আর কেহ তাড়া করিলে সাঁতরাইয়া তাহাকে ফাঁকি দেওয়াও যাইত। ইহার শরীরের গঠন দেখিলে মনে হয় যে, এই জন্তু সাঁতরাইতে খুব পটু ছিল।

এই সকল জন্তুর চিহ্ন অনেক সময় এরূপ স্থানে এবং এরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় যে, তাহা দেখিয়া বোধ হয়, তাহারা কাদায় ডুবিয়া মারা পড়িয়াছিল। খাল, বিল, হ্রদ ইত্যাদির

ধারে অনেক সময় ভয়ানক কাদা থাকে, সেই কাদায় পড়িয়া কত জন্তু এখনও মারা যাইতেছে। জলের গাছপালার ঠাণ্ডা রসাল ডগাগুলি অনেক জন্তুরই খুব প্রিয় বস্তু। বিশেষতঃ সেই জল যদি লোণা হয়, তবে তাহার ধারের পাঁক চাটিয়া নিরামিষভোজী জন্তুরা যারপরনাই সুখ পায়। এমন সরেস জিনিস পাইলে কি একটু খাইয়াই চলিয়া আসা যায়! যতক্ষণ পেটে স্থান থাকে, ততক্ষণ বসিয়া তাহা খাইতে হয়। এদিকে পাঁকের ভিতরে পা ঢুকিয়া যাইতেছে, তাহার খবর নাই। ব্রণ্টোসরসের মতন লম্বা গলা থাকিলে, একস্থানে বসিয়াই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত খাইবার সুবিধা হয়; আর ততক্ষণে তাহার পা হয়ত এতটা বসিয়া যায় যে, খাওয়া শেষ হইলে আর চলিয়া আসিবার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং সেইখানেই তাহার জীবনের শেষ হয়।

আজকালকার কুমীরদের ডিম হয়। ব্রণ্টোসরসের ডিম হইলে, তাহার এক একটা না জানি কত বড় হইত! কিন্তু ডাইনোসরেরা ডিম পাড়িত কি না, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের সন্দেহ আছে।

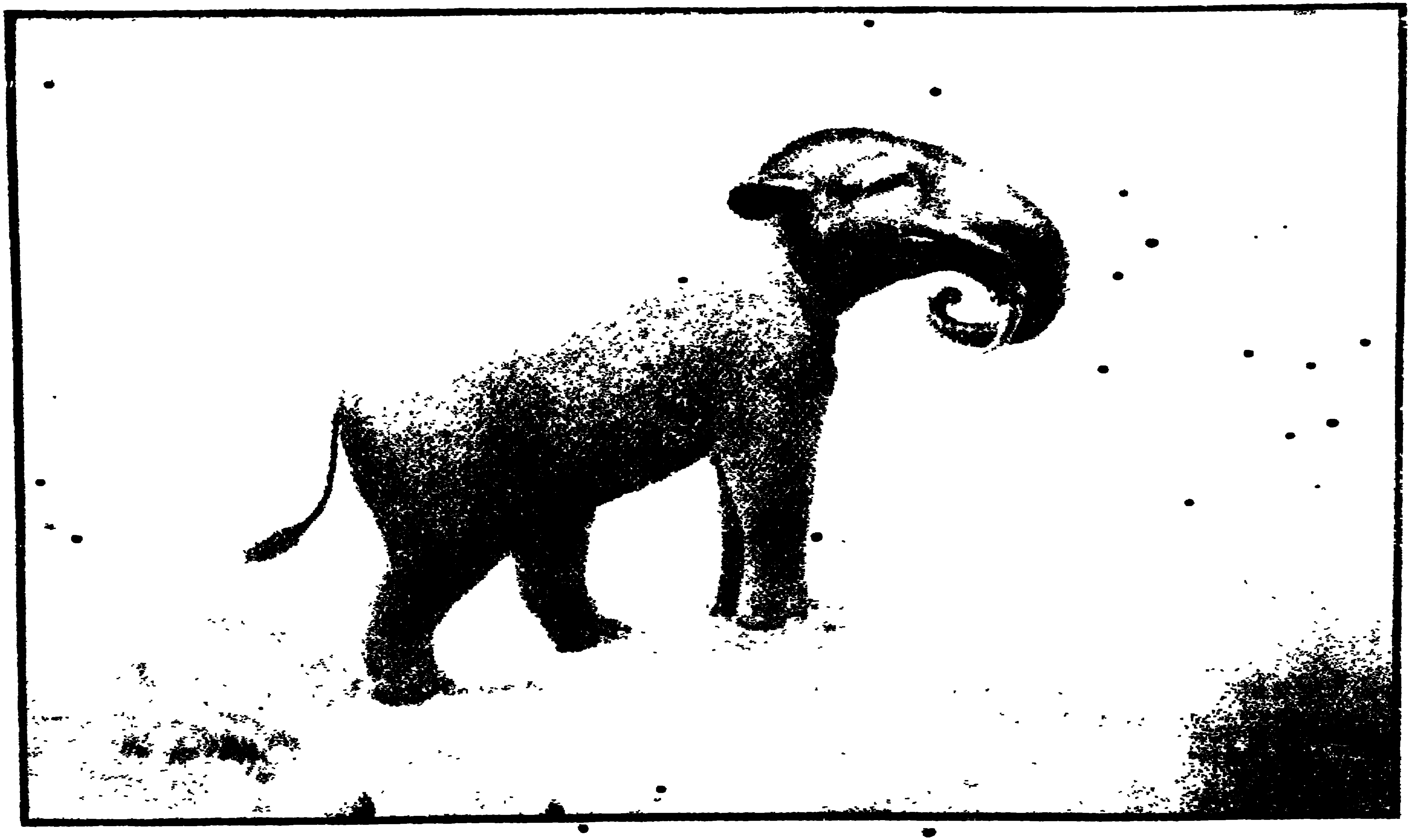

ডাইনোথীরিয়ম্।
সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন হস্তী। (৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।)

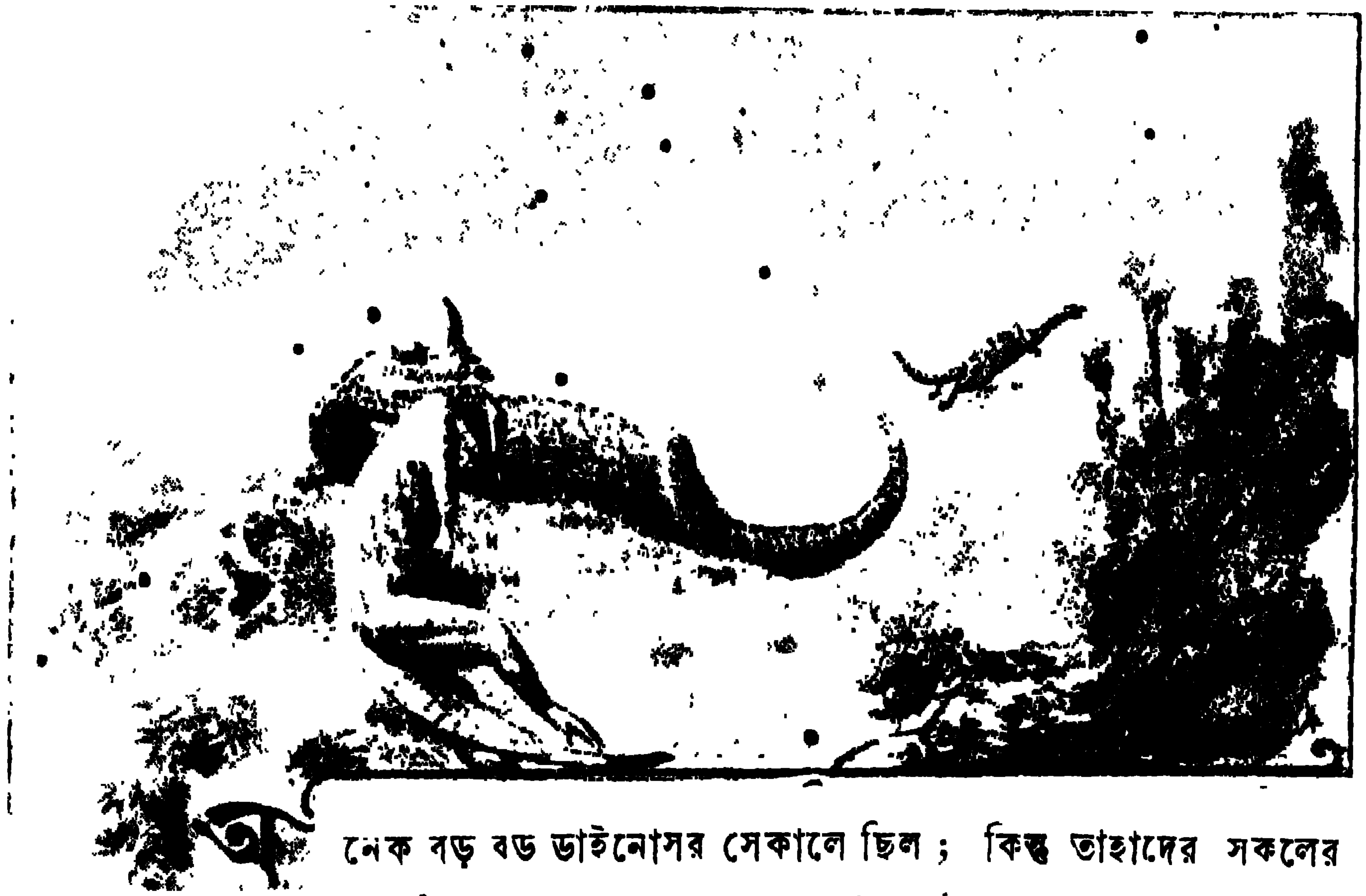

অনেক বড় বড় ডাইনোসর সেকালে ছিল ; কিন্তু তাহাদের সকলের কথা লিখিবার স্থান এই পুস্তকে নাই। এই সকল ডাইনোসর অনেক সময় খুব বড় বড় হইত বটে, কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ নিরামিষভোজী সাদাসিধে জন্তু ছিল।

মাংসখেকো ডাইনোসরগুলি এর চাইতে ছোট ছিল। তাই বলিয়া তাহারা নিতান্তই অবহেলার পাত্র ছিল, এমন ভাবিও না। আজকালকার বাঘ ভল্লুকগুলিকে কি তোমরা একটুও হিসাব কর না? লেজশুদ্ধ বারো ফুট লম্বা বাঘ অতি অল্পই আছে। কিন্তু এক একটা মাংসখেকো ডাইনোসর্ ত্রিশ ফুট লম্বা হইত! বাঘ হাতীর সমান বড় হইলে, তবে এইরূপ একটা জন্তুর সঙ্গে তাহার তুলনা হয়।

একটা মাংসভোজী ডাইনোসরের নাম "মিগালোসরস্" (ভীষণ কুম্ভীর)। ইহার চেহারা দেখিলে আজকালকার ক্যাঙ্গারুগুলির কথা মনে হয়। ইহাদের পিছনের পায়ের হাড়গুলির গঠন অনেকটা উটপাখীর হাড়ের গঠনের মতন। পিছনের দুইপায় ভর করিয়াই সচরাচর চলিত, চলিবার সময় সামনের পা বেশী ব্যবহার করিত না। কুমীরের দাঁত কেমন ভয়ানক তাহা সকলেই দেখিয়াছি। মিগালোসরসের ইহার চাইতেও ভয়ানক করাতের মতন দাঁত, এবং এর উপর আবার ভয়ানক ধারাল নখ ছিল। লাফাইবার আর ছুটিবার ক্ষমতাও অসাধারণ। সে সময়ে বাঘ ভল্লুক ছিল না; তাহার বদলে ইহারাই ছিল।

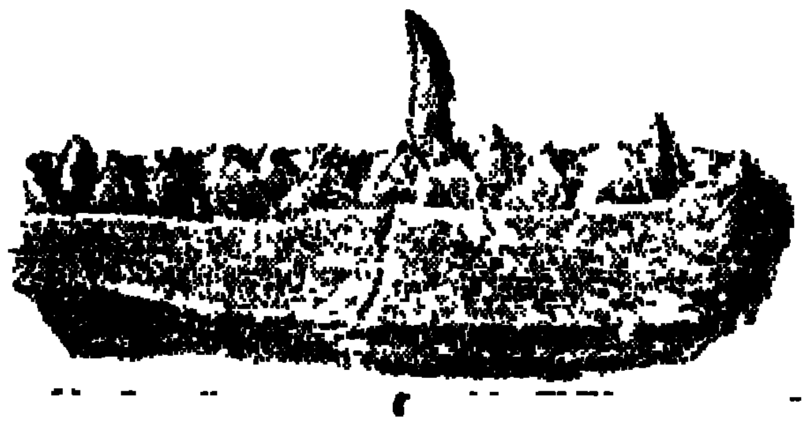

মিগালোসরসের দাঁত।

ডাইনোসর্ খুব প্রকাণ্ড ছিল, ভয়ানকও ছিল; আবার এক একটা নিতান্ত অদ্ভুতও ছিল। একটা ডাইনোসর্ ছিল, তাহাকে এখন পণ্ডিতেরা "ইগুয়ানোডন্" (অর্থাৎ-ইগুয়ানার মতন দাঁত যার;—ইগুয়ানা একরকম গোসাপ) বলিয়া থাকেন। প্রথমে এই জন্তুর দাঁত পাওয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া তখনকার সকলের চেয়ে বড় পণ্ডিত

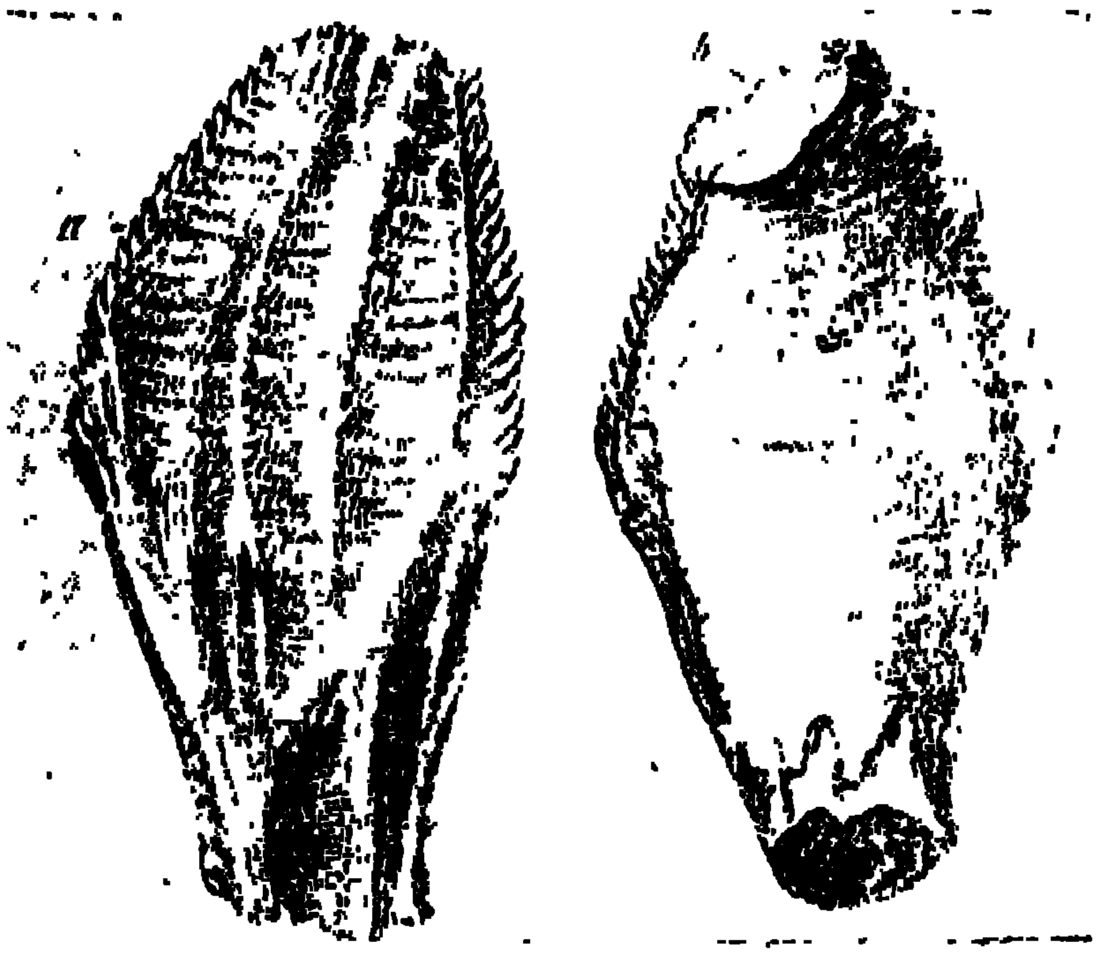

ইগুয়ানোডনের দাঁত।

কুভিয়ে বলিলেন, "এটা হিপপটেমসের দাঁত।" কিছুদিন পরে ঐ জন্তুর সাম্‌নের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের একটা নখ পাওয়া গেল। তাহা দেখিয়া কুভিয়ে বলিলেন,—"এটা গণ্ডারের শিং।" তোমরা হাসিও না। কুভিয়ে যেমন তেমন পণ্ডিত ছিলেন না। যে "কম্পারেটিভ্ এনাটমি" শাস্ত্রের গুণে আজ সেকালের জন্তুদের সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এত কথা জানিতে পারিয়াছেন, আর আমি তাহা পড়িয়া তোমাদিগকে ডাকিয়া এতগুলি আশ্চর্য্য কথা শুনাইতে বসিয়াছি—কুভিয়ে সেই "কম্পারেটিভ্ এনাটমি" শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। কুভিয়ের ভুল হইয়াছিল, ইহাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, জন্তুটার গঠন নিতান্তই অদ্ভুত ছিল।

ইগুয়ানোডনের দাঁতের বিষয়টা শীঘ্রই পরিষ্কার হইল; কিন্তু তাহার ঐ "গণ্ডারের শিঙের" মতন হাড়খানার অর্থ বুঝিতে কিছু সময় লাগিয়াছিল। আমরা ছেলেবেলায়

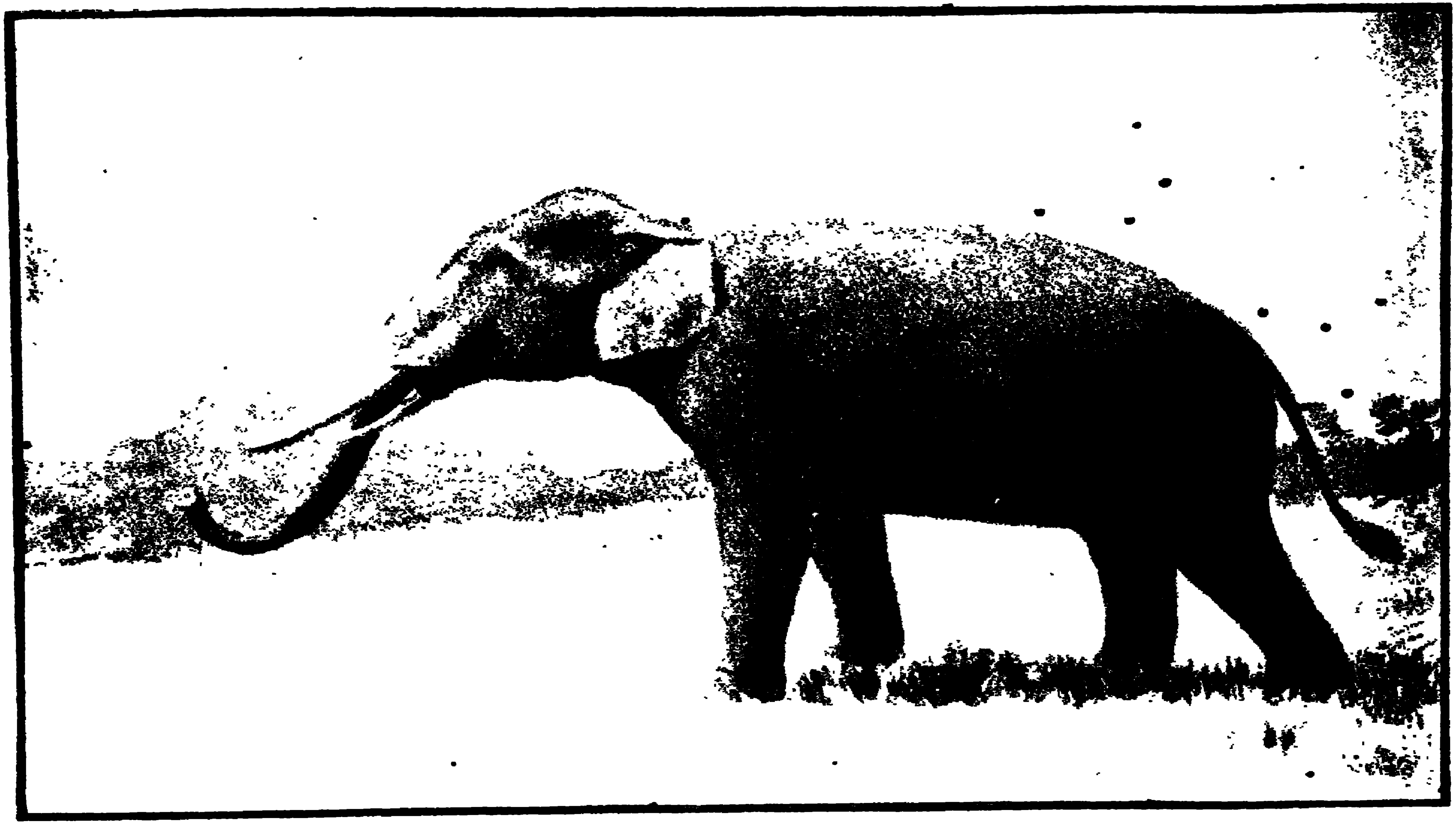

ম্যাষ্টোডন।

চারি দাঁতওয়ালা সেকালের হাতী। (৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।)

ইগুয়ানোডনের যে সকল ছবি দেখিতাম, তাহাতে উহার নাকের উপর, কতকটা গণ্ডারের শিংএর মতন একটি ছোট শিং থাকিত। শেষে, ঐ জন্তুর আরও অনেক হাড় পাওয়া গেলে পরে জানা গিয়াছে, যে উহা তাহার শিং নহে, হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখ। এই জন্তু নিরামিষ খাইত।

ইগুয়ানোডনের শিং ছিল না বটে, কিন্তু শিংওয়ালা ডাইনোসর্ সেকালে বিস্তর ছিল। এইরূপ একটা মাংসাশী জন্তুর নাম কিরাটোসরস্ (শৃঙ্গী কুম্ভীর)। এই জন্তু প্রায় মিগালোসরসের সমান বড়, আর ইহার নখ দাঁতও তেমনি ভয়ানক। ইহার নাকের উপর আবার গণ্ডারের শিংএর মতন একটা ভয়ানক শিং।

আর একটার নাম ট্রাইসিরেটপ্স্ (ত্রিশৃঙ্গানন, অর্থাৎ তিন শিংওয়ালা মুখ যার) ইহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন বেচারার গণ্ডার হইতে ভারি সাধ হইয়াছিল, আর তাহার জন্য সে বিশেষ চেষ্টাও করিয়াছিল—পারিয়াছিল কি না, পাঠক পাঠিকারা বলিবেন। যদি না পারিয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ দুঃখের কারণ দেখি না। গণ্ডারের এক শিং, ইহার তিন শিং। গায়ের চামড়াটি গণ্ডারের চামড়ার চাইতেও উঁচুদরের। ইহার উপর আবার গলায় হাঁসুলি! তোমরা হয়ত বলিবে "গোদের উপর বিষফোঁড়া।" ইহাতে আমার আপত্তি নাই, তবে বিষ ফোঁড়াটা দেখিতেছি গোদের চাইতেও বড় হইয়া গেল! লম্বায় এই জন্তু প্রায় পঁচিশ ফুট হইত। সুতরাং এ বিষয়েও গণ্ডারের জ্যাঠামহাশয়।

এর পর যাহার ছবি দেওয়া যাইতেছে তাহার নাম "ষ্টিগোসরস্" (চাল কুমীর)। ইহার পিঠ দেখিলে, খড়ো ঘরের চালের কথা মনে হয়, তাই এই নাম হইয়াছে! এই জন্তু প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা হইত।

ষ্টিগোসরসের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য একটা কথা আছে। এই জন্তুর কোমরের নীচে এমন একটা স্থান আছে, যে তাহা দেখিলে মনে হয়, উহার ঐ স্থানেও মস্তিষ্ক ছিল: একটা জন্তুর দুইটা মস্তিষ্ক, এ কথা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহার মাথায় যতটুকু মস্তিষ্কের স্থান তাহার দশগুণ বেশী মস্তিষ্কের স্থান কোমরের কাছে। এত মগজ যাহার, তাহার না জানি কতটা বুদ্ধি ছিল! মাঝে মাঝে এক একটা দশ বারো বছরের ছেলে দেখিতে পাই—সে চুরুট খাইতে শিখিয়াছে! আর ইহারই মধ্যে এত জিনিসের খবর লইয়াছে, যে তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়! তখন আমার এই ষ্টিগোসরসের কথা মনে পড়ে, আর একটিবার সেই ছেলের কোমরের দিকে চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, ওখানেও একটা বুদ্ধির ঝুলি আছে কি না! তোমরা তাহাকে দেখিলে হয় ত বলিবে "জ্যাঠা"। কিন্তু আমার মতে ইহাকে "চালকুমীর" বলিলে অধিক সঙ্গত হয়।

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে কুমীর গোসাপ ইত্যাদি জাতীয় জন্তু হইতেই পাখীর উৎপত্তি, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইক্‌থিয়োসরস্, প্লীসিয়োসরস্ প্রভৃতির ভিতরে পাখীর কোন লক্ষণ ছিল না। তার পর ডাইনোসর্ গুলির ভিতরে পাখীর লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। ইহাদের কোমরের হাড়, পিছনের পা, প্রভৃতি পাখীর মতন ছিল; ইহাদের পায়ের দাগ দেখিলে পাখীর পায়ের দাগ বলিয়া ভ্রম হয়।

ঠোঁটওয়ালা ডাইনোসর্ ইক্‌থিয়োসরস্ ও প্লীসিয়োসরসের সময় হইতেই ছিল। ইহাদের ঠোঁট পাখীর ঠোঁটের মতনই ছিল, তাহার উপর আবার অনেক সময় ইহাদের দাঁতও থাকিত। ইহাদের অনেকেই উড়িতে পারিত। কিন্তু তাহাদের পাখা পাখীর পাখার মতন ছিল না; কতকটা বাদুড়ের পাখার মতন ছিল। ইহাদের সাধারণ নাম টেরোড্যাক্টাইল্ (অঙ্গুলি পক্ষ)। আজ কাল যেমন ছোট বড় নানা প্রকার পাখী আছে, তেমনি ইহারাও নানা রকমের হইত। কোন কোনটা চড়াই পাখীর মতন ছোট ছিল; আবার কোন কোনটা ডানা মেলিলে ২৫ ফুট জায়গা ঢাকিয়া ফেলিত। খুব বড় গুলির দাঁত ছিল না। ইহাদের কোনটার লম্বা লেজ ছিল, আবার কোনটার লেজ প্রায় ছিল না বলিলেই হয়।

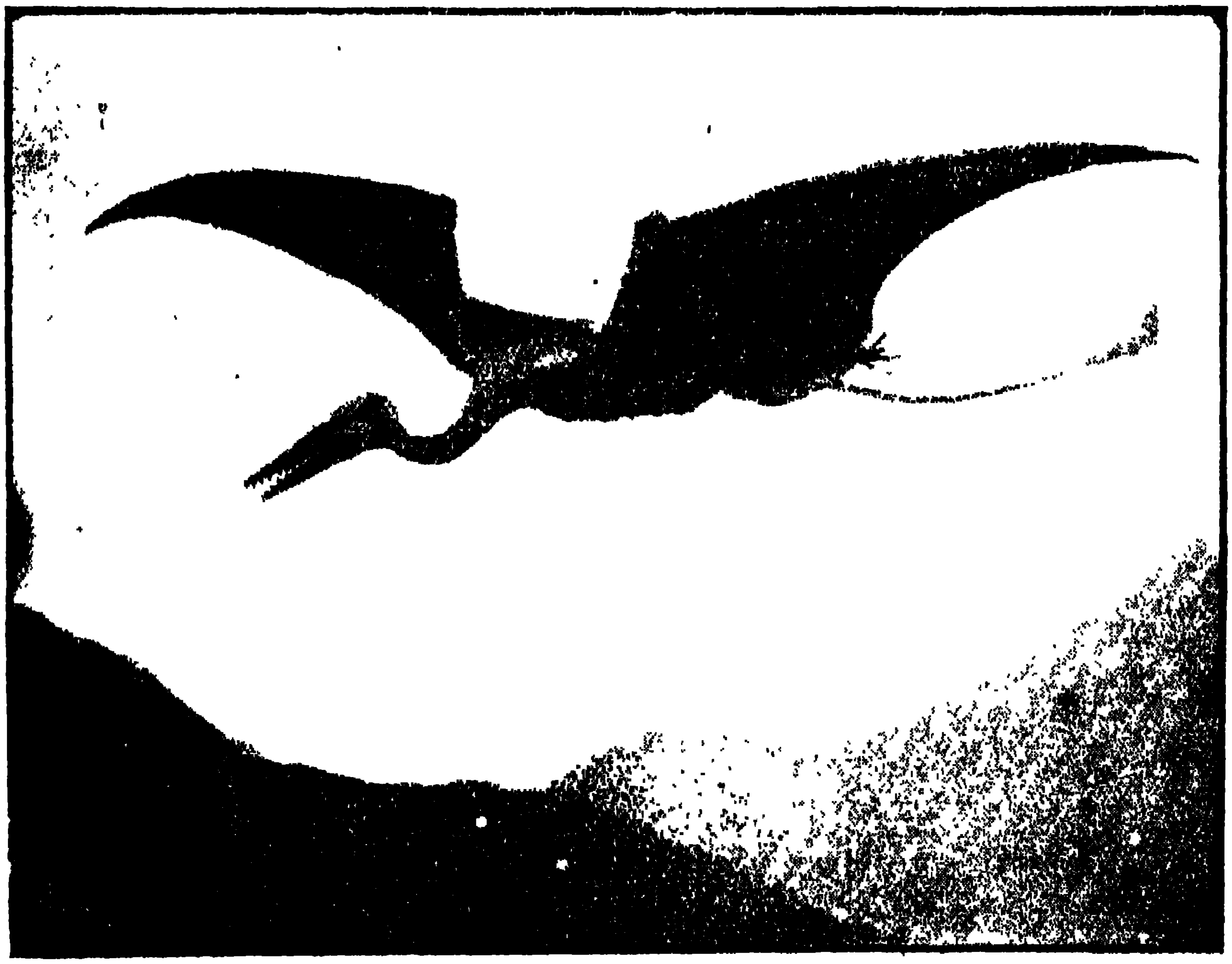

রাম্‌ফোরিংকস্।

রাম্‌ফোরিংকস্‌ বলিয়া এক রকম ছোট টেরোড্যাক্টাইল ছিল। ইহার লেজটি বেশ লম্বা; তাহার আগার গড়ন কতকটা গাছের পাতার মতন। খুব লম্বা বোঁটার আগায় একটী ছোট পাতা থাকিলে যেমন দেখায়, রামফোরিংকসের লেজ অনেকটা সেইরূপ ছিল। উড়িবার সময় এই লেজ দিয়া হালের কাজ চলিত। রামফোরিংকসের লেজের কথা ভাবিলে পাখীর পালকের কথা মনে হয়।

লিথোগ্রাফারেরা যে পাথরের উপর ছবি আঁকে, জর্ম্মাণি দেশে ঐরূপ পাথরের খনিতে রামফোরিংকসের চিহ্ন পাওয়া যায়। ঐ জাতীয় পাথরের খনিতে কাজ করিবার সময় মাঝে মাঝে দু একটি পাখীর পালকও দেখিতে পাওয়া যাইত। শেষে একবার একটা পাখীর অনেকগুলি হাড় ও পালক পাওয়া গেল। এই সকল চিহ্ন ঠিক যেরূপ অবস্থায় পাওয়া

আর্কিঅপ্টেরিক্সের হাড়।

গিয়াছিল, তাহার ছবি দেওয়া যাইতেছে। ইহাই পৃথিবীর প্রথম পক্ষী। যে স্থানে এই সকল চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল, তাহার নাম সোলেন্‌হফেন্‌। এইজন্য অনেক সময় ইহাকে

"সোলেন্‌হফেনের পাখী" বলা হয়। কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক নাম আর্কিঅপ্টেরিক্স্ (পুরাতন পাখী)।

এই চিহ্নগুলি দেখিলে পাখী ভিন্ন অন্য কোন জন্তুর চিহ্ন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি মনে কর, যে এটা ঠিক আজ কালকার পাখীর মতন ছিল, তবে বড় ভুল হইবে। ছবি খানিকে একবার ভাল করিয়া দেখ। ইহাতে এই পাখীর লেজটা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এ লেজ ত ঠিক পাখীর লেজের মতন নয়! পালকগুলি পাখীর পালকের মতন, তাহাতে ভুল নাই; কিন্তু আসল লেজটি যে গোসাপের, তাহা হাড় কয় খানি দেখিলেই বুঝা যায়। গোসাপের লেজে যোড়া যোড়া করিয়া পালক পরাইয়া, এই অদ্ভুত জন্তুর লেজ তৈয়ার হইয়াছে।

মাথায় কতকটা পাখীর মতন ঠোঁট আছে, আবার কুমীরের মতন দাঁতও আছে। ডানা দুখানি হঠাৎ দেখিলে পাখীর ডানা বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উহা ঠিক আজ কালকার পাখীর ডানা নহে। এখন আমরা কোন পাখীর ডানায় আঙ্গুল দেখিতে পাই না, (অর্থাৎ বাহির হইতে দেখিতে পাই না। পালকের ভিতরে খুঁজিয়া দেখিলে এখনও কোন কোন পাখীর ছোট ছোট আঙ্গুল দেখিতে পাওয়া যায়।) কিন্তু এই আশ্চর্য্য পাখীর প্রত্যেক ডানায় তিনটি করিয়া আঙ্গুল। শরীরের হাড়গুলি কতক পাখীর মতন, কতক গোসাপের মতন। এই পাখী কাকের মতন বড় হইত।

আজ কাল কোন পাখীর মুখে দাঁত দেখা যায় না, কিন্তু সেকালের অনেক পাখীর মুখে দাঁত ছিল। এই সকল দাঁতওয়ালা পাখীর চিহ্ন আমেরিকায় পাওয়া গিয়াছে। একটার নাম "হেস্পারর্নিস্" অর্থাৎ পশ্চিমের পাখী। আমেরিকা ইউরোপের পশ্চিমে, সুতরাং সেখানে যে পাখী পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাম পশ্চিমের পাখী। এই পাখী অনেকটা পেংগুইন্ পাখীর মতন ছিল। ইহার উড়িবার ক্ষমতা ছিল না; জলে সাঁতরাইয়া বেড়াইত। এইরূপ আর একটা পাখীর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাম "ইক্থিয়র্নিস্" অর্থাৎ মাছ-পাখী। ইহার মেরুদণ্ডের হাড়গুলি মাছের হাড়ের মতন ছিল, তাই ওরূপ নাম হইয়াছে।

বাস্তবিক সেকালের জন্তুগুলির ভিতরে মাছ, কুমীর, পাখী ইত্যাদিতে কেমন একটা খিচুড়ী পাকাইয়া গিয়াছিল। একটাকে ধরিয়া খাইতে পারিলে অনেক প্রকারের জন্তু খাওয়ার ফল হইত। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে তেমন আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আজ-কাল ওরূপ জন্তু দু একটা বাঁচিয়া থাকিলে আমরা উহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই আশ্চর্য্য মনে করিতাম না। এখন নাকি ওরূপ কিছু নাই, তাই এগুলি এত অদ্ভুত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শিবথীরিয়ম্।
গণ্ডার অপেক্ষাও বৃহৎ হিমালয়বাসী সেকালের জন্তু। (৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।)

আমাদের এই পৃথিবী আগে খুব গরম ছিল; তার পর ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে। পৃথিবীর ভিতরটা এখনও যে খুব গরম আছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে, সেই গরম স্থানটা অনেক খানি মাটির নীচে থাকায়, আমরা সহজে তাহা বুঝিতে পারি না। পৃথিবীর উপরকার খোলাট এখন বেশ পুরু হইয়াছে, তাহা ভেদ করিয়া ভিতরকার গরম সহজে বাহিরে পৌঁছাইতে পারে না।

পৃথিবীর খোলা যখন এত পুরু ছিল না, তখন তাহার ভিতরকার আগুনের তেজে তাহার বাহির অবধি বেশ গরম থাকিত। তখনকার পৃথিবী এখনকার পৃথিবী অপেক্ষা অনেক গরম ছিল; আর সেই গরমটা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সমান ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর খোলা সকল স্থানেই সমান পুরু, সুতরাং তাহার ভিতর দিয়া সকল স্থানেই সমান পরিমাণ উত্তাপ বাহিরে আসিত। সূর্য্যের তখন পৃথিবীর উপরে এতটা প্রভুত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। তখন এত গরম ছিল বলিয়া আজকালকার চাইতে সে সময়ে অনেক বেশী জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং আকাশ তখন খুব মেঘলা ছিল। সেই মেঘের ভিতর দিয়া সূর্য্যের তেজ অধিক পরিমাণে পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারিত না।

সে সময়ে আর এ সময়ে একটা মস্ত প্রভেদ তবে এই দেখা যাইতেছে যে, তখন পৃথিবী নিজের তেজেই গরম ছিল, আর এখন সূর্য্যের তেজটুকু না হইলেই সে শীতে কষ্ট পায়। এখন যে শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতুর পরিবর্ত্তন হয় তাহার কারণ ঐ সূর্য্য। সেকালের প্রথম এবং মধ্য অবস্থায় পৃথিবীর উপরে সূর্য্যের প্রাধান্য খুবই কম ছিল; সুতরাং আজকালকার

ন্যায় এরূপ শীত গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তন হইত না। তখন বারোমাসই গ্রীষ্মকাল; আকাশ মেঘলা; জমি স্যাঁৎসেতে। মেরুর কাছেও তখন এত বরফ ছিল না। গরম দেশের গাছ পালা তখন মেরুতেও জন্মিত।

সেকালের কথা বলিতে বলিতে আমরা এখন এমন একটা সময়ে আসিয়াছি যে, তখন পৃথিবীর নিজের তেজ কমিয়া গিয়া কতকটা আজকালকার মতন অবস্থা হইয়াছে। শীত, গ্রীষ্ম, ইত্যাদি ঋতুর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। আজকালকার মতন গাছপালা আর জন্তু ক্রমে অধিক পরিমাণে দেখা দিতেছে। ইহাই সেকালের শেষ অবস্থা। এখন হইতে স্তন্যপায়ী জন্তুর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া শেষে মনুষ্যের জন্ম হয়। যখন মানুষ আসিল, তখন আর "সেকাল" রহিল না—তখন "একালের" আরম্ভ হইল। সেকালের এই অবশিষ্ট অংশ-টুকুর কথা শেষ হইলেই এবারকার মতন পাঠক পাঠিকাদের নিকট ছুটি চাহিতে পারি।

প্রথম স্তন্যপায়ী জন্তুগুলি খুব ছোট ছোট ছিল। তাহাদের কথা ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। সেকালের বড় বড় স্তন্যপায়ী জন্তুগুলি প্রায়ই স্থূলচর্ম্মী (অর্থাৎ যাহাদের চামড়া মোটা—যেমন, হাতী, গণ্ডার, টেঁপির, শূয়র প্রভৃতি) জাতায় ছিল।

এই জাতীয় যে জন্তুটির হাড় প্রথমে আবিষ্কৃত হয়, তাহার নাম প্যালিয়োথীরিয়ম্, অর্থাৎ পুরাতন জন্তু। এই জন্তু দেখিতে অনেকটা টেঁপিরের মতন ছিল। নিরামিষ খেকো নিরীহ ভাল মানুষ জন্তু। কাহারও কোন অনিষ্ট করিত না। অনেকগুলি একত্রে দল বাঁধিয়া থাকিতে ভাল বাসিত।

ইহার কিছুকাল পরে পৃথিবীতে নানা জাতীয় হাতী দেখা দিল। পৃথিবীর অনেক স্থানেই এই সকল হাতীর চিহ্ন পাওয়া যায়। ইহাদের অনেকগুলি আমাদের আজকাল-কার হাতীর চাইতে বড় হইত।

প্রথমে যে হস্তী জাতীয় জন্তুর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল, পণ্ডিতেরা তাহার নাম রাখিয়াছেন, ডাইনোথীরিয়ম, অর্থাৎ ভয়ানক জন্তু। ছবিখানি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, অন্ততঃ চেহারায় জন্তুটী নিতান্তই ভয়ানক। এত বড় স্থলচর জন্তু পৃথিবীতে বেশী হয় নাই। এই জন্তুর একটা মাথা পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রায় তিন হাত লম্বা, আর দুই হাতেরও বেশী চওড়া। ইহার দাঁত দুটা কেমন অদ্ভুত ছিল, দেখ। এ রকম দাঁত দিয়া উহার কি কাজ হইত, তাহা বলা একটু কঠিন। উহাদ্বারা শুঁড়াইবার সুবিধা খুব কমই দেখা যাইতেছে। তবে, গাছের পাতা খাইবার সময় শুঁড় দিয়া বড় বড় ডাল বাঁকাইয়া ঐ দাঁতের দ্বারা তাহা আটকাইয়া রাখার সুবিধাটা বেশ ছিল বোধ হয়। তাহা ছাড়া এখনকার মহিষগুলির ন্যায়, এই জন্তুও হয় ত জলে পড়িয়া থাকিতে ভাল বাসিত। ওরূপ অবস্থায়

মিগাথীরিয়ম্।

শ্লথ জাতীয় সেকালের জন্তু। হাতী অপেক্ষাও বড় এবং বলবান ছিল। (৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।)

ঘুম পাইলে দাঁতগুলিকে কোন জিনিসে আটকাইয়া নিদ্রা যাওয়া মন্দ ছিল না। নাহিলে স্রোতে ভাসাইয়া নেওয়া আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, নামটি এবং চেহারাটি ভয়ানক হইলেও ইহার স্বভাব হিংস্র ছিল না। গাছ পালাই ইহার একমাত্র আহার ছিল।

ম্যাষ্টোডন্ নামক আর এক প্রকারের জন্তু ছিল, তাহার চেহারা অনেকটা হাতীরই মতন। কিন্তু তাহার শরীরের গঠন একটু লম্বাটে ধরণের, আর পাগুলি মোটা মোটা ছিল। আজকালকার হাতীর দুইটা দাঁত, কিন্তু অনেক ম্যাষ্টোডনের চারিটা দাঁত হইত। দুটা উপরে, দুটা নীচে। জন্তুটি বৃদ্ধ হইলে অনেক সময় তাহার নীচের দাঁত দুটা পড়িয়া যাইত।

আমেরিকায় বিস্তর ম্যাষ্টোড্‌ন্ ছিল। এখনও সেখানকার এক জাতীয় অসভ্য লোকদিগের মধ্যে এমন সব গল্প চলিত আছে যে, তাহা শুনিলে বোধ হয়, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ম্যাষ্টোডন দেখিয়াছে। ম্যাষ্টোডনের হাড়কে তাহারা বলে, "ষাঁড়ের বাপের হাড়।" তাহাদের বিশ্বাস যে, "ষাঁড়ের বাপটা" একটা ভারি ভয়ঙ্কর জন্তু ছিল; আর তখন পৃথিবীতে তেমনি বড় বড় মানুষও ছিল। মহাপুরুষ তাঁহার বজ্র দিয়া তাহাদের সকলকে মারিয়া ফেলেন। একদল ষাঁড়ের বাপ জুটিয়া মানুষের পোষা হরিণ মহিষ ইত্যাদি জন্তুকে মারিয়া ফেলিতেছিল। মহাপুরুষ তাঁহার বজ্র দিয়া তাহাদের আর সকলকেই মারিয়া ফেলিলেন, খালি পালের গোদাটাকে মারিতে পারিলেন না। সে তাঁহার বজ্র ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল। শেষে পাঁজরে বজ্রের ঘা খাইয়া বড় বড় হ্রদের দিকে পলাইয়া গেল। সেখানে সে আজও আছে।

আর এক রকমের হাতী ছিল, তাহার নাম ম্যামথ্। ইউরোপ এবং আসিয়ার অনেক স্থানে ম্যামথের দাঁত এবং হাড় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সকল দাঁত কুড়াইয়া এখনও অনেক লোকে ব্যবসায় চালাইতেছে। ম্যামথ্ হাতীর মত বড় হইত। সাইবিরিয়ায় এখনও অনেক ম্যামথের দেহ পাওয়া যায়। জন্তু মরিবার সময় বরফ চাপা পড়িলে, যতদিন না সেই বরফ গলিয়া যায়, তত দিন সেই জন্তু পচে না। সাইবিরিয়ায় শীত খুব বেশী। সেখানে এত বরফ পড়ে যে, অনেক স্থলেই সেই প্রাচীনকাল হইতে তিন চারি শত ফুট উচু হইয়া বরফ পড়িয়া আছে, আজও তাহা গলে নাই। এই সকল বরফের মধ্যে অনেক সময় মরা ম্যামথ্ পাওয়া যায়। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে ম্যামথ্ (হয়ত বরফ চাপা পড়িয়া) মরিয়াছিল, তাহা একটুও পচে নাই, এমনও দু এক স্থলে দেখা গিয়াছে।

বেঙ্কেন্‌ডর্ফ নামক রুষিয়া দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার ১৮৪৬ সালে ইন্দিগার্কা নদীতে এইরূপ একটা ম্যামথ্ পাইয়াছিলেন। এই ম্যামথ্‌টা ১৩ ফুট উচু আর ১৫ ফুট লম্বা ছিল। এক

একটা দাঁত আট ফুট লম্বা শুঁড় ছয় ফুট লম্বা। লেজ আর কাণে লোম নাই, তাহা ছাড়া সমস্ত শরীরে লোম। পিঠে আর কাঁধে এক ফুট লম্বা মোটা মোটা কেশরের মতন লোম। সেই মোটা লোমের নীচে খুব ঘন মোলায়েম পশম। লেজের আগায় এক গোছা লোম ছিল। জন্তুটার চেহারা দেখিতে বড়ই বিকট। হাতীর চেহারা তাহার কাছে কিছুই নয়।

মরিবার পূর্ব্বে এই ম্যামথটা ডাল পালা দিয়া জলযোগ করিয়াছিল। এত দিন পরে তাহার পেট চীরিয়া সেই সমস্ত ডাল পালা পাওয়া গেল। তাহার অধিকাংশই এক প্রকার ঝাউগাছের ডাল ও পাতা। সে রকম গাছ আজও ঐ সকল স্থানে জন্মায়।

ম্যামথ্ যে মানুষের সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিল, তাহাতে আর কোন ভুল নাই। প্রাচীন-কালের মানুষ আর ম্যামথের চিহ্ন একত্রে পাওয়া যায়। ম্যামথের দাঁতে প্রাচীন কালের চিত্রকর ম্যামথের ছবি আঁকিয়াছিল; সেই ছবি শুদ্ধ সেই দাঁত পাওয়া গিয়াছে। আমরা এই আশ্চর্য্য ছবির নমুনা দিলাম। ইহা অপেক্ষা পুরাতন ছবি পৃথিবীতে নাই। তখনকার

প্রাচীনকালের মানুষের আঁকা ম্যামথের ছবি।

মানুষ ধাতুর জিনিষ প্রস্তুত করিতে জানিত না; পাথরের কুচি দিয়া অস্ত্রের কাজ চালাইত। বোধ হয় ঐ পাথরের কুচির আঁচড় দিয়াই এই ছবিটিও আঁকিয়াছিল। এমত অবস্থায় ছবিটি এমন মন্দই বা কি হইয়াছে! আর, ভাল হউক আর মন্দ হউক, উহা ত ম্যামথেরই চেহারা। চিত্রকর ম্যামথ্ না দেখিয়া কখনই তাহা আঁকিতে পারে নাই, এ কথা নিশ্চয়।

আমাদের দেশে অনেক প্রকারের হাতী ছিল, তাহার একটির নাম ষ্টিগোডন্ গণেশ। এই হাতীর একটি মাথা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দাঁতশুদ্ধ চোদ্দ ফুট লম্বা। এক একটি দাঁত সাড়ে দশ ফুট লম্বা।

আর একটি জন্তু আমাদের দেশে ছিল, তাহার নাম শিবথীরিয়ম (শিবের জন্তু) এই জন্তু হরিণ আর জিরাফের মাঝামাঝি। ইহার চারিটি শিং ছিল। আকৃতি গণ্ডার অপেক্ষাও বড়।

আমাদের দেশে এক প্রকারের অতি বৃহৎ কচ্ছপ ছিল; তাহার একটা খোলা তোমাদের অনেকেই কলিকাতার যাদুঘরে দেখিয়া থাকিবে। এই খোলা দশ ফুট লম্বা, আর তাহার উপযুক্ত রূপ উঁচু এবং চওড়া। ইহার ভিতরে তিন চারিজন লোক অনায়াসে ঢুকিয়া

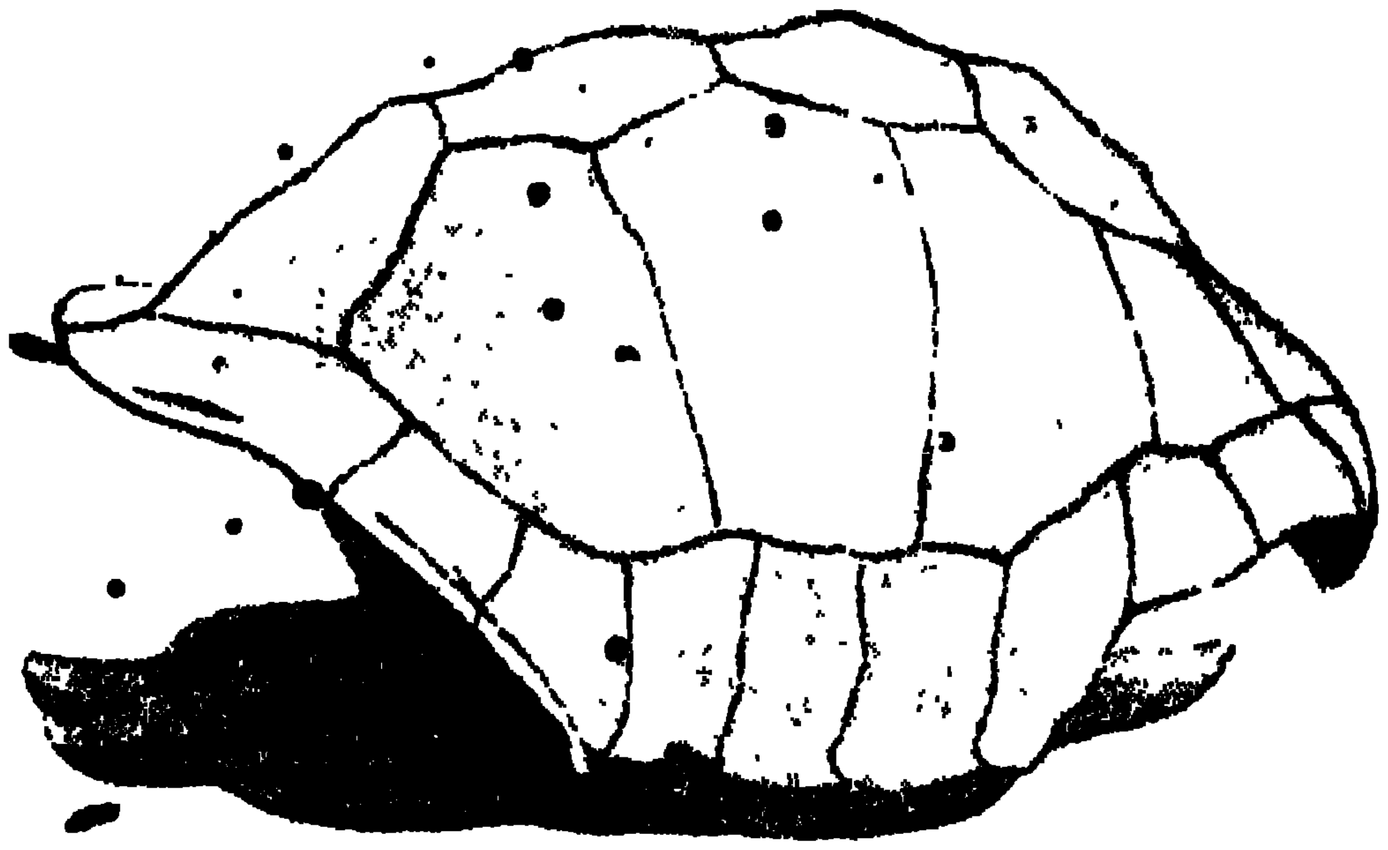

প্রাচীনকালের কচ্ছপের খোলা।

থাকিতে পারে। পুরাতন ভ্রমণ বৃত্তান্তের পুস্তকে এমন একটা দেশের উল্লেখ দেখা যায় যে সেখানকার লোকেরা এক একখানা আস্ত কচ্ছপের খোলা দিয়া ঘরের চাল প্রস্তুত করিত। এ সকল গল্প সত্য কি মিথ্যা বলিতে পারি না। কিন্তু যাদুঘরের ঐ কচ্ছপের খোলাটা দিয়া সন্ন্যাসী গোছের একজন লোক থাকিবার মতন একটা ঘরের চাল অনায়াসে হইতে পারে।

দেরাধুনের নিকট শিবলিক পর্ব্বতে এ সকল জন্তুর হাড় পাওয়া গিয়াছে। নর্ম্মদা নদীর ধারেও অনেক জন্তুর হাড় পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকায় শ্লথ্ জাতীয় কয়েকটি জন্তুর হাড় পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুটির নাম মিগাথীরিয়ম্ আর মাইলোডন্। মিগাথীরিয়ম শব্দের অর্থ ভয়ঙ্কর জন্তু। এই জন্তু হাতীর সমান বড় হইত। লম্বায় প্রায় আঠার ফুট।

ইহার পিছনের পা, লেজ এবং কোমরের হাড় হাতীর হাড়ের চাইতেও বড় আর মজবুত। ঐ সকল অঙ্গে যে উহার কত জোর ছিল, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই জন্তু গাছের পাতা খাইত। কিন্তু এত বড় জন্তুর গাছে উঠিয়া পাতা সংগ্রহ করা সম্ভব নহে, কাজেই সে গাছ ভাঙ্গিয়া কাজ সারিত। বাস্তবিক এমন প্রকাণ্ড আর ষণ্ডা একটা জন্তুতে ধরিয়া টানাটানি করিলে, বড় বড় গাছও ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা। এই জন্তুর একটা কঙ্কাল যাদুঘরে আছে।

মাইলোডন্ মিগাথীরিয়ম অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল। কেহ কেহ বলেন যে মাইলোডন্ নাকি আজও জীবিত আছে। এমন কি একদল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ইহার অনুসন্ধানে পাটাগোনিয়া দেশে গিয়াছেন। তাঁহাদের খুব আশা আছে, সেখানকার বনে অনুসন্ধান

করিয়া ইহাদের দু একটাকে ধরিয়া আনিতে পারিবেন। মাইলোডন শব্দের অর্থ "যাঁতার মতন দাঁত।"

নিউজীলণ্ড দ্বীপে মোয়া নামক এক প্রকার পক্ষীর হাড় পাওয়া যায়। এই পাখী প্রায় ১২।১৩ ফুট উচু হইত। দেখিতে অনেকটা উট পাখীর মতন ছিল। পাখা না থাকায়, উড়িবার ক্ষমতা ছিল না; লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইত। এই পাখী খুব অল্প দিন হইল লোপ পাইয়াছে। এমন কি কোন কোন প্রাচীন ভ্রমণকারী বলেন যে, তাঁহারা উহা দেখিয়াছেন। কিন্তু আজ কাল অনেক খুঁজিয়াও জীবন্ত মোয়া কেহ দেখিতে পায় না। মাদাগাস্কার দ্বীপে ইপিঅর্নিস্ নামক এক প্রকার পাখীর হাড় আর ডিম পাওয়া যায়। এ পাখীটাও মোয়ার মতনই বড় ছিল। ইহার একটা ডিম মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহা চৌদ্দ ইঞ্চি লম্বা। তাহার ভিতরে প্রায় দেড় শত মুরগীর ডিমের সমান জিনিস ধরিত।

সেকালের জন্তুর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয় নাই। সে সকল কথা তোমরা বড় হইয়া পড়িবে। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, পৃথিবীটা বুঝি খালি আমাদের জন্যই হইয়াছিল। আশা করি, এতক্ষণে আমাদের এই ভুলটা একটু শোধ্রাইতে চলিয়াছে। জলে বুড়বুড়ি উঠে, আবার তখনই তাহা জলে মিশিয়া যায়। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত জন্তু সকল এইরূপ ভাবেই আসিতেছে যাইতেছে। সকলেরই দুদিনের খেলা, দুদিনে ফুরাইয়াছে। এখন মানুষ যে তাহার চাইতে বেশী দিনের জন্য আসিয়াছেন, এ কথা মনে করিবার আমাদের অধিকার কি? যাহা হউক পাঠক পাঠিকারা এ সকল কথা ভাবিয়া মন খারাপ করিবেন না। শেষে যাহাই ঘটুক আমাদের তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই। পৃথিবীর বয়সের হিসাবে যাহা দুদিন, আমাদের পক্ষে তাহা ঢের দিন। সুতরাং এখন শেষ করি।